আল আম্বিয়া

২১

নামকরণ

কোনো বিশেষ আয়াত থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়নি। এর মধ্যে যেহেতু ধারাবাহিকভাবে বহু নবীর কথা আলোচিত হয়েছে তাই এর নাম রাখা হয়েছে "আল আম্বিয়া"। এটাও সূরার বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং নিছক সূরা চিহ্নিত করার একটি আলামত মাত্র।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী উভয়ের দৃষ্টিতেই মনে হয় এর নাযিলের সময়-কাল ছিল মক্কী জীবনের মাঝামাঝি অর্থাৎ আমাদের বিভক্তিকরণের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় ভাগে। শেষ ভাগের সূরাগুলোর মধ্যে অবস্থার যে বৈশিষ্ট পাওয়া যায় এর পটভূমিতে তা ফুটে ওঠে না।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছিল এ সূরায় তা আলোচিত হয়েছে। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবী এবং তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করতো তার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে তাঁর মুকাবিলায় যেসব কৌশল অবলম্বন করা হতো সেগুলোর বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাদের অশুভ ফলাফল জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যে ধরনের গাফলতি ও ঔদ্ধত্যের মনোভাব নিয়ে তাঁর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের জন্য দুঃখ ও বিপদ মনে করছো তিনি আসলে তোমাদের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন।

ভাষণের মধ্যে বিশেষভাবে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলো নিচে দেয়া হলো ঃ

এক ঃ মানুষ কখনো রসূল হতে পারে না, মক্কার কাফেরদের এ বিভ্রান্তি এবং এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল মেনে নিতে অস্বীকার করাকে—বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে নিরসন ও খণ্ডন করা হয়েছে।

দুই ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা এবং কোনো একটি কথার ওপর অবিচল না থাকার–ওপর সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু অত্যন্ত জোরালো ও অর্থপূর্ণ পদ্ধতিতে পাকড়াও করা হয়েছে।

তিনঃ তাদের ধারণা ছিল, জীবন নেহাতই একটি খেলা, কিছুদিন খেলা করার পর তাকে এমনিই খতম হয়ে যেতে হবে, এর কোনো ফল বা পরিণতি ভুগতে হবে না। কোনো প্রকার হিসেব নিকেশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অবকাশ এখানে নেই।–যে ধরনের গাফলতি ও অবজ্ঞা সহকারে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছিল, ঐ ধারণাই যেহেতু তার মূল ছিল, তাই বড়ই হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে এর প্রতিকার করা হয়েছে।

চার ঃ শিরকের প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা এবং তাওহীদের বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ ছিল তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে বিরোধের মূল ভিত্তি।–এর সংশোধনের জন্য শিরকের বিরুদ্ধে ও তাওহীদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত কিন্তু মোক্ষম ও চিত্তাকর্ষক যুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

পাঁচ ঃ এ ভুল ধারণাও তাদের ছিল যে, নবীকে বারবার মিথ্যা বলা সত্ত্বেও যখন তাদের ওপর কোনো আযাব আসে না তখন নিশ্চয়ই নবী মিথ্যুক এবং তিনি আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আযাবের ভয় দেখান তা নিছক অন্তসারশূন্য হুমকি ছাড়া আর কিছুই নয়।–একে যুক্তি ও উপদেশ উভয় পদ্ধতিতে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এরপর নবীগণের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী থেকে কতিপয় নজির পেশ করা হয়েছে। এগুলো থেকে একথা অনুধাবন করানোই উদ্দেশ্য যে, মানবেতিহাসের বিভিন্ন যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব পয়গম্বর এসেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন মানুষ। নবুওয়াতের বিশিষ্ট গুণ বাদ দিলে অন্যান্য গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের মতোই মানুষ ছিলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের গুণাবলী এবং খোদায়ীর সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে ছিল না। বরং নিজেদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের জন্য তারা সবসময় আল্লাহর সামনে হাত পাততেন। এই সংগে একই ঐতিহাসিক নজির থেকে আরো দু'টি কথাও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, নবীদের ওপর বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ এসেছে এবং তাঁদের বিরোধীরাও তাঁদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সকল নবী একই দীনের অনুসারী ছিলেন এবং সেটি ছিল সেই দীন যেটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করছেন। এটিই মানব সম্প্রদায়ের আসল ধর্ম। বাদবাকি যতগুলো ধর্ম দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো নিছক পথভ্রষ্ট মানুষদের বিভেদাত্মক প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, এ দীনের অনুকরণ ও অনুসরণের ওপরই মানুষের নাজাত ও মুক্তি নির্ভরশীল। যারা এ দীন গ্রহণ করবে তারাই আল্লাহর শেষ আদালত থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে এবং তারাই হবে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। আর যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা আখেরাতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হবে। শেষ বিচারের সময় আসার আগেই আল্লাহ নিজের নবীর মাধ্যমে মানুষকে এ সত্য সম্পর্কে

অবহিত করে চলছেন, এটি তাঁর বিরাট মেহেরবানী। এ অবস্থায় নবীর আগমনকে যারা নিজেদের জন্য রহমতের পরিবর্তে ধ্বংস মনে করে তারা অজ্ঞ ও মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়।

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ①

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ② لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ③

মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় কাছে এসে গেছে,[১] অথচ সে গাফলতির মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে।[২] তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে যে উপদেশ আসে,[৩] তা তারা দ্বিধাগ্রস্তভাবে শোনে এবং খেলার মধ্যে ডুবে থাকে,[৪] তাদের মন (অন্য চিন্তায়) আচ্ছন্ন।

আর জালেমরা পরস্পরের মধ্যে কানাকানি করে যে, "এ ব্যক্তি মূলত তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কি, তাহলে কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর ফাঁদে পড়বে ?"[৫]

১. এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত নিকটবর্তী। অর্থাৎ লোকদের নিজেদের কাজের হিসেব দেবার জন্য তাদের রবের সামনে হাজির হবার সময় আর দূরে নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন একথারই আলামত যে, মানব জাতির ইতিহাস বর্তমানে তার শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করছে। এখন সে তার সূচনাকালের পরিবর্তে পরিণামের বেশী নিকটবর্তী হয়ে গেছে। সূচনা ও মধ্যবর্তীকালীন পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং এবার শেষ পর্যায় শুরু হয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একটি হাদীসে একথাই বলেছেন। তিনি নিজের হাতের দু'টি আঙ্গুল পাশাপাশি রেখে বলেনঃ

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

"আমার আগমন এমন সময়ে ঘটেছে যখন আমি ও কিয়ামত এ দু'টি আঙ্গুলের মতো অবস্থান করছি।"

অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই আছে। মাঝখানে অন্য কোনো নবী আগমনের অবকাশ নেই। যদি সংশোধিত হয়ে যেতে চাও তাহলে আমার দাওয়াত গ্রহণ করে সংশোধিত হও। আর কোনো সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী আসবেন না।

২. অর্থাৎ কোনো সতর্ক সংকেত ও সতর্কবাণীর প্রতি দৃষ্টি দেয় না। নিজেরাও পরিণামের কথা ভাবে না, আর যে নবী তাদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করছেন তাঁর কথাও শোনে না।

৩. অর্থাৎ কুরআনের যে নতুন সূরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয় এবং তাদেরকে শুনানো হয়।

৪. وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ-এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ ওপরে অনুবাদে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে খেলা মানে হচ্ছে এই জীবনের খেলা। আল্লাহ ও আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল লোকেরা এ খেলা খেলছে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা গুরুত্ব ও মনোযোগ সহকারে তা শোনে না বরং খেলা, ঠাট্টা-তামাসা ও কৌতুকচ্ছলে তা শুনে থাকে।

৫. "পড়ে যেতে থাকবে"-ও অনুবাদ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। মক্কার যেসব বড় বড় কাফের সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলা করার চিন্তায় বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিল তারাই পরস্পর বসে বসে এই কানাকানি করতো। তারা বলতো, এ ব্যক্তি তো কোনোক্রমে নবী হতেই পারে না। কারণ এতো আমাদেরই মতো মানুষ, খায় দায়, বাজারে ঘুরে বেড়ায়, স্ত্রী-সন্তানও আছে। কাজেই এর মধ্যে এমন নতুন কথা কি আছে যা তাকে আমাদের থেকে বিশিষ্ট করে এবং আমাদের মোকাবিলায় তাঁকে আল্লাহর সাথে একটি অস্বাভাবিক সম্পর্কের অধিকারী করে ? তবে কিনা এ ব্যক্তির কথাবার্তায় এবং এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যাদু আছে। ফলে যে ব্যক্তি এর কথা কান লাগিয়ে শোনে এবং এর কাছে যায়, সে এর ভক্ত হয়ে পড়ে। কাজেই যদি নিজের ভালো চাও তাহলে এর কথায় কান দিয়ো না এবং এর সাথে মেলামেশা করো না। কারণ এর কথা শোনা এবং এর নিকটে যাওয়া সুস্পষ্ট যাদুর ফাঁদে নিজেকে আটকে দেয়ার মতই।

যে কারণে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে "যাদু"র অভিযোগ আনতো তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রাচীন সীরাত লেখক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (মৃত্যু ১৫২ হিঃ) তাঁর সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, একবার উত্‌বা ইবনে আবী রাবীআহ (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর এবং কলিজা খাদক হিন্দার বাপ) কুরাইশ সরদারদেরকে বললো, যদি আপনারা পছন্দ করেন তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করি এবং তাকে বুঝাবার চেষ্টা করি। এটা ছিল হযরত হামযার (রা) ইসলাম গ্রহণের পরবর্তীকালের ঘটনা। তখন নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছিল এবং এ অবস্থা দেখে কুরাইশ সরদাররা বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। লোকেরা বললো, হে আবুল ওলীদ ! তোমার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। তুমি অবশ্যই গিয়ে তার সাথে কথা বলো। সে নবী করীম (স)-এর কাছে গিয়ে বললো, "হে ভাতিজা ! আমাদের এখানে তোমার যে মর্যাদা ছিল তা তুমি নিজেই জানো এবং বংশের দিক দিয়েও তুমি

একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তুমি নিজের জাতির ওপর একটি বিপদ চাপিয়ে দিয়েছো ? তুমি সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেছো। সমগ্র জাতিকে বোকা ঠাউরেছো। তার ধর্ম ও উপাস্যদের দুর্নাম করেছো। মৃত বাপ-দাদাদের সবাইকে তুমি পথভ্রষ্ট ও কাফের বানিয়ে দিয়েছো। হে ভাতিজা! যদি এসব কথা ও কাজের মাধ্যমে দুনিয়ায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এসো আমরা সবাই মিলে তোমাকে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ দিয়ে দেবো যে, তুমি সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে যাবে। নেতৃত্ব চাইলে আমরা তোমাকে নেতা মেনে নিচ্ছি। বাদশাহী চাইলে তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দিচ্ছি। আর যদি তোমার কোনো রোগ হয়ে থাকে যে কারণে সত্যিই তুমি শয়নে-জাগরণে কিছু দেখতে পাচ্ছো, তাহলে আমরা সবাই মিলে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সহায়তায় তোমার রোগ নিরাময় করবো।" এসব কথা সে বলতে থাকলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরবে সব শুনতে থাকলেন। যখন সে যথেষ্ট বলে ফেলেছে তখন নবী করীম (স) বললেন," আবুল ওলীদ! আপনি যা কিছু বলতে চান সব বলে শেষ করেছেন, নাকি এখনো কিছু বলার বাকি আছে ?" সে বললো, হাঁ, আমার বক্তব্য শেষ, তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে এখন আপনি আমার কথা শুনুন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এরপর কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি একনাগাড়ে সূরা হা-মীম-আস সাজাদাহ্ তেলাওয়াত করতে থাকলেন এবং উত্‌বা পেছনে মাটির ওপর হাত ঠেকিয়ে দিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকলো। আটতিরিশ আয়াতে পৌঁছে তিনি সিজদা করলেন এবং তারপর মাথা উঠিয়ে উত্‌বাকে বললেন, "হে আবুল ওলীদ! আমার যা কিছু বলার ছিল তা আপনি শুনে নিয়েছেন, এখন আপনার যা করার আপনি করবেন।"

উত্‌বা এখান থেকে উঠে কুরাইশ সরদারদের কাছে ফিরে যেতে লাগলো। লোকেরা তাকে দূর থেকে আসতে দেখে বললো,"আল্লাহর কসম, আবুল ওলীদের চেহারা পাল্‌টে গেছে। যে চেহারা নিয়ে সে এখান থেকে গিয়েছিল এটা সে চেহারা নয়। তার ফিরে আসার সাথে সাথেই লোকেরা প্রশ্ন করলো, "বলো, হে আবুল ওলীদ! তুমি কি করে এলে ?" সে বললো, "আল্লাহর কসম! আজ আমি এমন কালাম শুনেছি যা এর আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, এ কবিতা নয়, যাদুও নয়, গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণীও নয়। হে কুরাইশ জনতা! আমার কথা মেনে নাও এবং এ ব্যক্তিকে এর অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। এর যেসব কথা আমি শুনেছি তা একদিন স্বরূপে প্রকাশিত হবেই। যদি আরবরা তার ওপর বিজয়ী হয় তাহলে তোমাদের ভাইয়ের রক্তপাতের দায় থেকে তোমরা মুক্ত থাকবে। অন্যেরা তার দায়ভার বহন করবে। আর যদি সে আরবদের ওপর বিজয়ী হয় তাহলে তার শাসন কর্তৃত্ব হবে তোমাদেরই শাসন কর্তৃত্ব এবং তার সম্মান তোমাদেরই সম্মানে রূপান্তরিত হবে।" লোকেরা বললো, "আল্লাহর কসম, হে আবুল ওলীদ! তুমিও তার যাদুতে আক্রান্ত হয়েছো।" সে বললো, "এটা আমার ব্যক্তিগত মত। এখন তোমরা নিজেরাই তোমাদের সিদ্ধান্ত নেবে।" (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩১৩-৩১৪পৃঃ) ইমাম বায়হাকী এ ঘটনা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন তার একটিতে এতটুকু বাড়িয়ে

বলা হয়েছে যে, যখন নবী করীম (স) সূরা হা-মীম আস সাজদাহ তেলাওয়াত করতে করতে এ আয়াতে পৌঁছে গেলেন—

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ

(তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও, আমি তো তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি এমন একটি আকস্মিক আযাবে পতিত হওয়া থেকে, যেমন আযাবে পতিত হয়েছিল আদ ও সামুদ।) তখন উত্‌বাহ স্বতস্ফূর্তভাবে সামনের দিকে এগিয়ে এসে তাঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠলো, আল্লাহর দোহাই নিজের জাতির প্রতি করুণা করো।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ইবনে ইসহাক এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ একবার আরাশ গোত্রের একজন লোক কিছু উট নিয়ে মক্কায় এলো। আবু জেহেল তার উটগুলো কিনে নিলো। যখন সে দাম চাইলো তখন আবু জেহেল টালবাহানা করতে লাগলো। আরাশী ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন কা'বার হারমে কুরাইশ সরদারদেরকে ধরলো এবং প্রকাশ্য সমাবেশে ফরিয়াদ করতে থাকলো। অন্যদিকে হারাম শরীফের অন্য প্রান্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে ছিলেন। কুরাইশ সরদাররা তাকে বললো, "আমরা কিছুই করতে পারবো না। দেখো, ঐ দিকে ঐ কোণে যে ব্যক্তি বসে আছে তাকে গিয়ে বলো। সে তার কাছ থেকে তোমার টাকা আদায় করে দেবে।" আরাশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। কুরাইশ সরদাররা পরস্পর বলতে লাগলো, "এবার মজা হবে।" আরাশী গিয়ে নবী করীম (স)-এর কাছে নিজের অভিযোগ পেশ করলো, তিনি তখনই উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে নিয়ে আবু জেহেলের গৃহের দিকে রওয়ানা দিলেন। সরদাররা তাদের পেছনে একজন লোক পাঠিয়ে দিল। আবু জেহেলের বাড়ীতে কি ঘটে তা সে সরদারদেরকে জানাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোজা আবু জেহেলের দরজায় পৌঁছে গেলেন এবং শিকল ধরে নাড়া দিলেন। সে জিজ্ঞেস করলো, "কে ?" তিনি জবাব দিলেন, "মুহাম্মাদ।" সে অবাক হয়ে বাইরে বের হয়ে এলো। তিনি তাকে বললেন, "এ ব্যক্তির পাওনা দিয়ে দাও।" সে কোনো দ্বিরুক্তি না করে ভেতরে চলে গেলো এবং উটের দাম এনে তার হাতে দিল। এ অবস্থা দেখে কুরাইশদের প্রতিবেদক হারাম শরীফের দিকে দৌড়ে গেলো এবং সরদারদেরকে সমস্ত ঘটনা শুনাবার পর বললো, আল্লাহর কসম! আজ এমন বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলাম, যা এর আগে কখনো দেখিনি। হাকাম ইবনে হিশাম (অর্থাৎ আবু জেহেল) যখন গৃহ থেকে বের হয়ে মুহাম্মাদকে দেখলো তখনই তার চেহারার রং ফিকে হয়ে গেলো এবং যখন মুহাম্মাদ তাকে বললো, তার পাওনা দিয়ে দাও তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন হাকাম ইবনে হিশামের দেহে প্রাণ নেই। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ২৯-৩০ পৃঃ)

এ ছিল ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের প্রভাব। আবার অন্যদিকে ছিল কালাম ও বাণীর প্রভাব যাকে তারা যাদু মনে করতো এবং অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকদেরকে এ বলে ভয় দেখাতো যে, এ লোকটির কাছে যেয়ো না, কাছে গেলেই তোমাদেরকে যাদু করে দেবে।

قَلَ رَبِّى يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ز وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ بَلْ قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ج فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۝ مَآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا ج أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝

রসূল বললো, আমার রব এমন প্রত্যেকটি কথা জানেন যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বলা হয়, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৬]

তারা বলে, "বরং এসব বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন, বরং এসব তার মনগড়া বরং এ ব্যক্তি কবি।[৭] *নয়তো সে আনুক একটি নিদর্শন যেমন পূর্ববর্তীকালের নবীদেরকে পাঠানো হয়েছিল নিদর্শন সহকারে।" অথচ এদের আগে আমি যেসব জনবসতিকে ধ্বংস করেছি, তাদের কেউ ঈমান আনেনি। এখন কি এরা ঈমান আনবে ?*[৮]

৬. অর্থাৎ নবী কখনো মিথ্যা প্রচারণা ও গুজব রটনার এ অভিযানের (Whispering Campaign) জবাবে এ ছাড়া অন্য কোনো কথা বলেননি যে, "তোমরা যেসব কথা তৈরি করো, সেগুলো জোরে জোরে বলো বা চুপিসারে কানে কানে বলো, আল্লাহ সবই শোনেন ও জানেন।" তিনি কখনো অন্যায়পন্থী শুক্রর সাথে মুখোমুখি বিতর্ক করেন না।

৭. এর পটভূমি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রভাব যখন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, মক্কার সরদাররা পরস্পর পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে, তাঁকে মোকাবিলা করার জন্য একটি জোরদার প্রচারাভিযান চালাতে হবে। মক্কায় যিয়ারত করার জন্য যে ব্যক্তিই আসবে তার মনে পূর্বাহ্নেই তাঁর বিরুদ্ধে এত বেশী কুধারণা সৃষ্টি করে দিতে হবে যার ফলে সে তাঁর কোনো কথায় কান দিতে রাজিই হবে না। এমনিতে এ অভিযান বছরের বারো মাসই জারি থাকতো কিন্তু বিশেষ করে হজ্জের মওসুমে বিপুল সংখ্যক লোক চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হতো, তারা বাইর থেকে আগত সকল যিয়ারতকারীর তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিতো যে, এখানে এমন এমন ধরনের একজন লোক আছে, তার ব্যাপারে সাবধান থেকো। এসব আলোচনার সময় নানান ধরনের কথা বলা হতো। কখনো বলা হতো, এ ব্যক্তি যাদুকর। কখনো বলা হতো, সে নিজেই একটা বাণী রচনা করে বলছে এটা আল্লাহর বাণী। কখনো বলা হতো, আরে হাঁ, তা আবার এমন কি বাণী ! ডাহা পাগলের প্রলাপ এবং অগোছালো চিন্তার একটা আবর্জনা স্তুপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কখনো বলা হতো, কিছু কবিত্বমূলক ভাব-কল্পনা ও ছন্দ-গাথাকে সে আল্লাহর বাণী নাম দিয়ে রেখেছে। যেনতেনভাবে লোকদেরকে প্রতারিত করাই ছিল উদ্দেশ্য। কোনো একটি কথার ওপর অবিচল থেকে একটি মাপাজোকা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তারা পেশ করছিল না।

কারণ সত্যের কোনো প্রশ্নই তাদের সামনে ছিল না। কিন্তু এ মিথ্যা প্রচারণার ফল যা হলো তা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিল। মুসলমানদের বছরের পর বছরের প্রচেষ্টায় তার যে প্রচার ও পরিচিতি হওয়া সম্ভবপর ছিল না কুরাইশদের এ বিরোধিতার অভিযানে তা মাত্র সামান্য কিছু সময়ের মধ্যেই হয়ে গেলো। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একটি প্রশ্ন জাগলো, যার বিরুদ্ধে এ বিরাট অভিযান, এ মারাত্মক অভিযোগ, কে সেই ব্যক্তি ? আবার অনেকে ভাবলো তার কথা তো শোনা উচিত। আমরা তো আর দুধের শিশু নই যে, অযথা তার কথায় পথভ্রষ্ট হবো।

এর একটি মজার দৃষ্টান্ত হচ্ছে তোফাইল ইবনে আমর দাওসীর ঘটনা। ইবনে ইসহাক বিস্তারিত আকারে তাঁর নিজের মুখেই এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেনঃ আমি দাওস গোত্রের একজন কবি ছিলাম। কোনো কাজে মক্কায় গিয়েছিলাম। সেখানে পৌছতেই কুরাইশদের কয়েকজন লোক আমাকে ঘিরে ফেললো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কথা বললো। ফলে তাঁর সম্পর্কে আমার মনে খারাপ ধারণা জন্মালো। আমি স্থির করলাম, তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকবো। পর দিন আমি হারাম শরীফে গেলাম। দেখলাম তিনি কা'বা গৃহের কাছে নামায পড়ছেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত কয়েকটি বাক্য আমার কানে পড়লো। আমি অনুভব করলাম, বড় চমৎকার বাণী। মনে মনে বললাম, আমি কবি, যুবক, বুদ্ধিমান। আমি কোনো শিশু নই যে, ঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবো না। তাহলে এ ব্যক্তি কি বলেন, এর সংগে কথা বলে জানার চেষ্টা করি না কেন। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করে চলে যেতে লাগলেন তখন আমি তাঁর পিছু নিলাম। তাঁর গৃহে পৌছে তাঁকে বললাম, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার সম্পর্কে আমাকে এসব কথা বলেছিল, ফলে আমি আপনার ব্যাপারে এতই খারাপ ধারণা পোষণ করেছিলাম যে, নিজের কানে তুলো ঠেসে দিয়েছিলাম, যাতে আপনার কথা শুনতে না পাই। কিন্তু এখনই যে কয়েকটি বাক্য আমি আপনার মুখ থেকে শুনেছি তা আমার কাছে বড়ই চমৎকার মনে হয়েছে। আপনি কি বলেন, আমাকে একটু বিস্তারিতভাবে জানান। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কুরআনের একটি অংশ শুনালেন। তাতে আমি এত বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়লাম যে, তখনই ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম। সেখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি নিজের পিতা ও স্ত্রীকে মুসলমান করলাম। এরপর নিজের গোত্রের মধ্যে অবিরাম ইসলাম প্রচারের কাজ করতে লাগলাম। এমন কি খন্দকের যুদ্ধের সময় পর্যন্ত আমার গোত্রের সত্তর আশিটি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো। (ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ২২-২৪ পৃঃ)

ইবনে ইসহাক যে আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, কুরাইশ সরদাররা নিজেদের মাহফিলগুলোতে নিজেরাই একথা স্বীকার করতো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যেসব কথা তৈরি করে সেগুলো নিছক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি লিখেছেন ঃ একটি মজলিসে নযর ইবনে হারেস বক্তৃতা প্রসংগে বলে, "তোমরা যেভাবে মুহাম্মাদের মোকাবিলা করছো তাতে কোনো কাজ হবে না। সে যখন যুবক ছিল তখন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সদাচারী ব্যক্তি ছিল। সবচেয়ে বড় সত্যনিষ্ঠ ও সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিল। আর এখন তার চুল সাদা হতে যাচ্ছে, এখন তোমরা বলো কিনা সে যাদুকর, গণক, কবি, পাগল। আল্লাহর কসম,

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِیْٓ اِلَیْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ⑦ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا یَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِیْنَ ⑧ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَیْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِیْنَ ⑨ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَیْكُمْ كِتٰبًا فِیْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ⑩

আর হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বেও আমি মানুষদেরকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম, যাদের কাছে আমি অহী পাঠাতাম।[৯] তোমরা যদি না জেনে থাকো তাহলে আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করো।[১০] সেই রসূলদেরকে আমি এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খেতো না এবং তারা চিরজীবিও ছিল না। তারপর দেখে নাও আমি তাদের সাথে আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছি এবং তাদেরকে ও যাকে যাকে আমি চেয়েছি রক্ষা করেছি এবং সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।[১১]

হে লোকেরা ! আমি তোমাদের প্রতি এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে তোমাদেরই কথা আছে, তোমরা কি বুঝ না ?[১২]

সে যাদুকর নয়। আমি যাদুকরদের দেখেছি এবং তাদের ঝাড়ফুঁক সম্পর্কেও জানি। আল্লাহর কসম, সে গণক নয়। আমি গণকদের তন্ত্রমন্ত্র শুনেছি, তারা যেসব রহস্যময় ও বহুমুখী কথা বলে থাকে তা আমি জানি। আল্লাহর কসম, সে কবিও নয়। কবিতার বিভিন্ন প্রকারের সাথে আমি পরিচিত। তার বাণী এর কোনো প্রকারের মধ্যেই পড়ে না। আল্লাহর কসম, সে পাগল নয়। পাগল যে অবস্থায় থাকে এবং সে যে প্রলাপ বকে সে ব্যাপারে কি আমরা কেউ অনভিজ্ঞ ? হে কুরাইশ সরদাররা! অন্য কিছু চিন্তা করো। তোমরা যে বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছো এসব ঠুনকো কথায় তাকে পরাজিত করবে, ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়।" এরপর সে এই প্রস্তাব পেশ করলো যে, আরবের বাহির থেকে রুস্তম ও ইস্ফিন্দিয়ারের কাহিনী এনে ছড়াতে হবে। লোকেরা সেদিকে আকৃষ্ট হবে এবং তা তাদের কাছে কুরআনের চাইতেও বেশী বিস্ময়কর মনে হবে। সেই অনুসারে কিছুদিন এই পরিকল্পনা কার্যকর করার কাজ চলতে লাগলো। এবং নযর নিজেই গল্প বলার কাজ শুরু করে দিল। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩২০-৩২১ পৃঃ)

৮. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিদর্শন দেখাবার দাবীর যে জবাব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে তিনটি বিষয় রয়েছে। এক, পূর্ববর্তী রসূলদেরকে যে ধরনের নিদর্শন দেয়া হয়েছিল তোমরা তেমনি ধরনের নিদর্শন চাচ্ছো ? কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছো হঠকারী লোকেরা সেসব

নিদর্শন দেখেও ঈমান আনেনি। দুই, তোমরা নিদর্শনের দাবী তো করছো কিন্তু একথা মনে রাখছো না যে, সুস্পষ্ট মু'জিযা স্বচক্ষে দেখে নেবার পরও যে জাতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে তারা এরপর শুধু ধ্বংসই হয়ে গেছে। তিন, তোমাদের চাহিদামতো নিদর্শনাবলী না পাঠানো তো তোমাদের প্রতি আল্লাহর একটি বিরাট মেহেরবাণী. কারণ এ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর হুকুম শুধুমাত্র অস্বীকারই করে আসছো কিন্তু এ জন্য তোমাদের ওপর আযাব পাঠানো হয়নি। এখন কি তোমরা নিদর্শন এ জন্য চাচ্ছো যে, যেসব জাতি নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনেনি এবং এ জন্য তাদেরকে ধ্বংস কর দেয়া হয়েছে তোমরাও তাদের মতো একই পরিণতির সম্মুখীন হতে চাও ?

৯. এটি হচ্ছে "এ ব্যক্তি তোমাদের মতই একজন মানুষ" তাদের এ উক্তির জবাব. তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানবিক সত্তাকে তাঁর নবী না হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে পেশ করতো। জবাব দেয়া হয়েছে যে, পূর্ব যুগের যেসব লোককে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে বলে তোমরা মানো তাঁরা সবাইও মানুষ ছিলেন এবং মানুষ থাকা অবস্থায়ই তাঁরা আল্লাহর অহী লাভ করেছিলেন. (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন ১১ টীকা)

১০. অর্থাৎ যে ইহুদীরা ইসলাম বৈরিতার ক্ষেত্রে আজ তোমাদের সাথে গলা মিলিয়ে চলছে এবং তোমাদেরকে বিরোধিতা করার কায়দা কৌশল শেখাচ্ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, মূসা ও বনী ইসরাঈলের অন্যান্য নবীগণ কী ছিলেন ? মানুষ ছিলেন, না অন্য কোনো জীব ?

১১. অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইতিহাসের শিক্ষা শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলে না যে, পূর্বে যেসব রসূল পাঠানো হয়েছিল তারা মানুষ ছিলেন বরং একথাও বলে যে, তাঁদের সাহায্য ও সমর্থন করার এবং তাঁদের বিরোধিতাকারীদেরকে ধ্বংস করে দেবার যতগুলো অংগীকার আল্লাহ তাঁদের সাথে করেছিলেন সবই পূর্ণ হয়েছে এবং যেসব জাতি তাদের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিল তারা সবাই ধ্বংস হয়েছে। কাজেই এখন নিজেদের পরিণতি তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে নাও।

১২. মক্কার কাফেররা কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অবিন্যস্তভাবে যেসব কথা বলে চলছিল যে, তিনি যা এনেছেন তা কবিত্ব, যাদু, বিভ্রান্ত স্বপ্ন, মনগড়া কাহিনী ইত্যাদি। এটি হচ্ছে সেগুলোর একটি সম্মিলিত জবাব। এতে বলা হচ্ছে, এ কিতাবে এমন কি অভিনব কথা বলা হচ্ছে যা তোমরা বুঝতে পারছো না, যে কারণে সে সম্পর্কে তোমরা এত বেশী বিপরিতধর্মী মত গঠন করছো ? এর মধ্যে তো তোমাদের নিজেদের কথাই বলা হয়েছে। তোমাদেরই মনস্তত্ব ও তোমাদেরই ব্যবহারিক জীবনের কথা আলোচনা করা হয়েছে. তোমাদেরই স্বভাব, প্রকৃতি, গঠনাকৃতি এবং সূচনা ও পরিণামের কথা বলা হয়েছে। তোমাদেরই পরিবেশ থেকে এমনসব নিদর্শন বাছাই করে করে পেশ করা হয়েছে যা প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিত করে. তোমাদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহ থেকে দোষ-গুণের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেখানো হচ্ছে, যা সঠিক বলে তোমাদের নিজেদের বিবেকই সাক্ষ দেয়। এসব কথার মধ্যে কী এমন জটিল বিষয় আছে, যা বুঝতে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অক্ষম ?

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا
آخَرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾
لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ
دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿١٦﴾

২ রুকূ'

কত অত্যাচারী জনবসতিকে আমি বিধ্বস্ত করে দিয়েছি এবং তাদের পর উঠিয়েছি অন্য জাতিকে। যখন তারা আমার আযাব অনুভব করলো,[১৩] *পালাতে লাগলো সেখান থেকে। (বলা হলো) "পালায়ো না, চলে যাও তোমাদের গৃহে ও ভোগ্য সামগ্রীর মধ্যে, যেগুলোর মধ্যে তোমরা আরাম করছিলে, হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"*[১৪] *বলতে লাগলো, "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম।" আর তারা এ আর্তনাদ করতেই থাকে যতক্ষণ আমি তাদেরকে কাটা শস্যে পরিণত না করি, জীবনের একটি স্ফুলিংগও তাদের মধ্যে থাকেনি।*

এ আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছুই আছে এগুলো আমি খেলাচ্ছলে তৈরি করিনি।[১৫]

১৩. অর্থাৎ যখন আল্লাহর আযাব মাথার ওপর এসে পড়েছে এবং তারা জানতে পেরেছে যে, তাদের ধ্বংস এসে গেছে।

১৪. এটি বড়ই অর্থবহ বাক্য। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন একটু ভালোভাবে এ শাস্তিটি প্রত্যক্ষ করো, যাতে কাল যদি কেউ এর অবস্থা জিজ্ঞেস করে তাহলে যেন ভালোভাবে বলতে পারো। নিজের আগের ঠাটবাট বজায় রেখে সাড়ম্বরে আবার মজলিস গরম করো। হয়তো এখনো তোমাদের চাকরেরা বুকে হাত বেঁধে জিজ্ঞেস করবে, হুজুর, বলুন কি হুকুম। নিজের আগের পরিষদ ও কমিটি নিয়ে বসে যাও, হয়তো এখনো তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শ ও জ্ঞানপুষ্ট মতামত থেকে লাভবান হবার জন্য দুনিয়ার লোকেরা তৈরি হয়ে আছে।

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ۖ إِنْ كُنَّا
فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ
زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا
يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمِ اتَّخَذُوا
آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾

যদি আমি কোনো খেলনা তৈরি করতে চাইতাম এবং এমনি ধরনের কিছু আমাকে করতে হতো তাহলে নিজেরই কাছ থেকে করে নিতাম।[১৬] কিন্তু আমি তো মিথ্যার ওপর সত্যের আঘাত হানি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়িয়ে দেয় এবং সে দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়। আর তোমাদের জন্য ধ্বংস! যেসব কথা তোমরা তৈরি করো সেগুলোর বদৌলতে।[১৭]

পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যে সৃষ্টিই আছে তা আল্লাহরই।[১৮] আর যে (ফেরেশতারা) তাঁর কাছে আছে[১৯] তারা না নিজেদেরকে বড়-মনে করে তাঁর বন্দেগী থেকে বিমুখ হয় এবং না ক্লান্ত ও বিষণ্ন হয়,[২০] দিন রাত তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকে, বিরাম-বিশ্রাম নেয় না।

এদের তৈরি মাটির দেবতাগুলো কি এমন পর্যায়ের যে, তারা (প্রাণহীনকে প্রাণ দান করে) দাঁড় করিয়ে দিতে পারে ?[২১]

১৫. জীবন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভংগীর কারণে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতো না এটি হচ্ছে সেই সমগ্র দৃষ্টিভংগির ওপর মন্তব্য। তাদের ধারণা ছিল, মানুষকে দুনিয়ায় এমনিই স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নিজের যা ইচ্ছা সে করবে। যেভাবে চাইবে করবে। তার কোনো কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। কারো কাছে তাকে হিসেব দিতে হবে না। ভালো-মন্দ কয়েক দিনের এই জীবন যাপন করে সবাইকে ব্যস এমনিই ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। পরবর্তী কোনো জীবন নেই, যেখানে ভালো কাজের পুরস্কার ও খারাপ কাজের শাস্তি দেয়া হবে। এসব ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা আসলে একথাই ব্যক্ত করছিল যে, বিশ্ব-জাহানের এ সমগ্র ব্যবস্থা নিছক একজন খেলোয়াড়ের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়, কোনো গুরুগম্ভীর ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও

লক্ষ একে পরিচালিত করছে না। আর এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাই তাদের নবীর দাওয়াত অবহেলা করার আসল কারণ ছিল।

১৬. অর্থাৎ যদি আমি খেলা করতেই চাইতাম তাহলে খেলনা বানিয়ে নিজেই খেলতাম। এ অবস্থায় একটি অনুভূতিশীল, সচেতন ও দায়িত্বশীল প্রাণী সৃষ্টি এবং তার মধ্যে সত্য-মিথ্যার এ দ্বন্দ্ব ও টানাহেঁচড়ার অবতারণা করে নিছক নিজের আনন্দ ও কৌতুক করার জন্য অন্যকে অনর্থক কষ্ট দেবার মতো জুলুম কখনোই করা হতো না। তোমাদের মহান প্রভু আল্লাহ এ দুনিয়াটাকে রোমান সম্রাটদের রংগভূমি (Colosseum) রূপে তৈরি করেননি। এখানে বান্দাদেরকে পরস্পরের মধ্যে লড়াই করিয়ে তাদের শরীরের গোশত ছিঁড়ে উৎক্ষিপ্ত করিয়ে আনন্দের অট্টহাসি হাসা হয় না।

১৭. অর্থাৎ আমি বাজিকর নই। খেলা-তামাসা করা আমার কাজ নয়। আমার এ দুনিয়া একটা বাস্তবানুগ ব্যবস্থা। কোনো মিথ্যা এখানে টিকে থাকতে পারে না। মিথ্যা যখনই এখানে মাথা উঠায় তখনই সত্যের সাথে তার অনিবার্য সংঘাত বাধে এবং শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে থাকে। এ দুনিয়াকে যদি তুমি খেলাঘর মনে করে জীবন অতিবাহিত করো অথবা সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা মতবাদের ভিত্তিতে কাজ করে থাকো তাহলে এর ফল হবে তোমার নিজেরই ধ্বংস। মানব জাতির ইতিহাস দেখো, দুনিয়াকে নিছক একটি খেলাঘর, ভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটি থালা ও একটি ভোগ-বিলাসের লীলাভূমি মনে করে যেসব জাতি এখানে জীবন যাপন করেছে এবং নবীগণ কথিত সত্য বিমুখ হয়ে মিথ্যা মতবাদের ভিত্তিতে কাজ করেছে, তারা একের পর এক কোন্ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। তারপর বুদ্ধিমান যখন বুঝাতে থাকে তখন তাকে বিদ্রূপ করা এবং যখন নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল আল্লাহর আযাবের আকারে মাথার ওপর এসে পড়ে তখন "হায় আমাদের দুর্ভাগ্য অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম" বলে গলা ফাটানো কোন্ ধরনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে।

১৮. এখান থেকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক বাতিলের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হচ্ছে। এটিই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে বিরোধের মূল বিষয়। এখন মুশরিকদেরকে একথা বলা হচ্ছে যে, বিশ্ব-জাহানের এই যে ব্যবস্থার মধ্যে তোমরা জীবন যাপন করছো (যে সম্পর্কে এখনই বলা হলো যে, এটা কোনো খেলোয়াড়ের খেলনা নয়, যে সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে যে, এটা একটা বাস্তবানুগ উদ্দেশ্যমুখীন ও সত্যভিত্তিক ব্যবস্থা এবং যে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এখানে মিথ্যা সবসময়ে সত্যের সাথে সংঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।) এর প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে এই যে, এ সমগ্র ব্যবস্থার স্রষ্টা, মালিক, শাসক ও প্রতিপালক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। অন্যদিকে এ সমগ্র ব্যবস্থাকে বহু ইলাহর মিলিত সাম্রাজ্য মনে করা বা একজন বড় প্রভুর প্রভুত্বের মধ্যে অন্যান্য ছোট ছোট প্রভুদেরও কিছু শরীকানা আছে বলে মনে করে নেয়াই হচ্ছে এ সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা।

১৯. অর্থাৎ আরব মুশরিকরা যেসব ফেরেশতাকে আল্লাহর সন্তান অথবা প্রভুত্ব কর্তৃত্বে শামিল মনে করে মাবুদ বানিয়ে রেখেছিল।

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾

যদি আকাশে ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ হতো তাহলে (পৃথিবী ও আকাশ) উভয়ের ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেতো।[২২] কাজেই এরা যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে আরশের রব আল্লাহ[২৩] তা থেকে পাক-পবিত্র। তাঁর কাজের জন্য (কারো সামনে) তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে না বরং তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।

তাঁকে বাদ দিয়ে তারা কি অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে ? হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, "তোমাদের প্রমাণ আনো। এ কিতাবও হাজির, যার মধ্যে আছে আমার যুগের লোকদের জন্য উপদেশ এবং সে কিতাবগুলোও হাযির, যেগুলোর মধ্যে ছিল আমার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য নসীহত।"[২৪] কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই প্রকৃত সত্য থেকে বেখবর, কাজেই মুখ ফিরিয়ে আছে।[২৫] আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তার প্রতি এ অহী করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই কাজেই তোমরা আমারই বন্দেগী করো।

২০. অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগী করা তাদের কাছে বিরক্তিকর নয়। এমন নয় যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আল্লাহর বন্দেগী করতে করতে তাদের মনে কোনো প্রকার মলিনতার সৃষ্টি হয়। মূলে لايستحسرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে استحسار এর মধ্যে ক্লান্তির বাহুল্য পাওয়া যায় এবং এর অর্থ হচ্ছে এমন ধরনের ক্লান্তি যা বিরক্তিকর কাজ করার ফলে সৃষ্টি হয়।

২১. মূলে ينشرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি انشار থেকে উদ্ভূত। 'ইনশার' মানে হচ্ছে কোনো পড়ে থাকা প্রাণহীন বস্তুকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া। যদিও এ শব্দটিকে কুরআন মজীদে সাধারণত মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তবুও

এর পারিভাষিক অর্থ বাদ দিলে মূল আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দটি নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমরা মনে করি এ শব্দটি এখানে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যেসব সত্তাকে তারা ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে এবং যাদেরকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে নিষ্প্রাণ বস্তুর বুকে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে? যদি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে এ শক্তি না থেকে থাকে আর আরবের মুশরিকরা নিজেরাই একথা স্বীকার করতো যে, এ শক্তি কারো মধ্যে নেই—তাহলে তারা তাদেরকে ইলাহ ও মাবুদ বলে মেনে নিচ্ছে কেন?

২২. এটি একটি সরল ও সোজা যুক্তি আবার গভীর তাৎপর্যপূর্ণও। এটি এত সহজ সরল কথা যে, একজন মরুচারী বেদুঈন, সরল গ্রামবাসী এবং মোটা বুদ্ধির অধিকারী সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে। কথাটি হচ্ছে, একটি মামুলি ছোট্ট গৃহের যদি দুজন গৃহকর্তা হয় তাহলে সে গৃহের ব্যবস্থাপনা চারদিনও ভালোভাবে চলতে পারে না। আর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি হচ্ছে, বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা পৃথিবীর ভূগর্ভ স্তর থেকে নিয়ে দূরবর্তী গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সবকিছুই একটি বিশ্বজনীন নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এর অসংখ্য ও অগণিত জিনিসগুলোর মধ্যে যদি পারস্পরিক সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, সমতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত না থাকতো তাহলে এ ব্যবস্থাটি এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারতো না। আর কোনো প্রবল প্রতাপান্বিত আইন এ অসংখ্য বস্তু ও শক্তিকে পূর্ণ সমতা ও ভারসাম্য সহকারে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে বাধ্য না করতে থাকা পর্যন্ত এসব কিছু সম্ভব নয়। এখন এটা কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, বহু স্বতন্ত্র স্বাধীন শাসকের রাজ্যে একই আইন এ ধরনের নিয়মানুবর্তিতা সহকারে চলতে পারে? নিয়ম ও শৃংখলা যে বজায় আছে এটাই নিয়ম পরিচালকের একক অস্তিত্বকে অপরিহার্য করে তোলে। আইন ও শৃংখলার ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা নিজেই একথার সাক্ষ দেয় যে, ক্ষমতা একই সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেন্দ্রীভূত রয়েছে এবং এ সার্বভৌম কর্তৃত্ব বিভিন্ন শাসকদের মধ্যে বিভক্ত নয়। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা বনী ইসরাঈল ৪৭ ও সূরা আল মু'মিনূন ৮৫ টীকা।)

২৩. "রব্বুল আরশ" অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের শাসক ও মালিক।

২৪. প্রথম যুক্তি দু'টি ছিল বুদ্ধিভিত্তিক এবং এখন এ যুক্তিটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনভিত্তিক ও প্রামাণ্য। এর অর্থ হচ্ছে, আজ পর্যন্ত যতগুলো কিতাবই আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার কোনো দেশে কোনো জাতির পয়গম্বরের প্রতি নাযিল হয়েছে তার মধ্য থেকে যে কোনো একটি খুলে একথা দেখিয়ে দাও যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ প্রভুত্বের কর্তৃত্বের সামান্যতম অধিকারী এবং অন্য কেউ ইবাদাত ও বন্দেগীর সামান্যতমও হকদার। তাহলে তোমরা এ কোন্ ধরনের ধর্ম তৈরি করে রেখেছো যার সমর্থনে বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো প্রমাণ নেই এবং আসমানী কিতাবগুলোও এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করে না?

২৫. তারা জ্ঞানের নয় অজ্ঞতার কারণে নবীর কথাকে আমল দেয় না। প্রকৃত সত্য তারা জানে না, তাই যারা বুঝাতে চায় তাদের কথার প্রতি দৃষ্টি দেবার দরকারই মনে করে না।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

এরা বলে, "করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেন।"[২৬] সুবহানাল্লাহ! তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা। তারা তাঁর সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং শুধুমাত্র তাঁর হুকুমে কাজ করে। যাকিছু তাদের সামনে আছে এবং যাকিছু আছে তাদের অগোচরে সবই তিনি জানেন। যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ সম্মত তাদের পক্ষে ছাড়া আর কারো সুপারিশ তারা করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত।[২৭] আর তাদের মধ্যে যে বলবে, আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দান করবো, আমার এখানে এটিই যালেমদের প্রতিফল।

২৬. এখানে আবার ফেরেশতাদেরই কথা বলা হয়েছে। আরবের মুশরিকরা তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে গণ্য করতো। পরবর্তী ভাষণ থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে যায়।

২৭. মুশরিকরা দু'টি কারণে ফেরেশতাদেরকে মাবুদে পরিণত করতো। এক, তাদের মতে তারা ছিল আল্লাহর সন্তান। দুই, তাদেরকে পূজা (খোশামোদ তোশামোদ) করার মাধ্যমে তারা তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের জন্য শাফায়াতকারীতে (সুপারিশকারী) পরিণত করতে চাচ্ছিল। যেমন -

وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَاۤءِ شُفَعَاۤؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ (يونس : ١٨) এবং

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى (الزمر : ٣)

এ আয়াতগুলোতে এ দুটি কারণই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এ জায়গায় এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন সাধারণত শাফায়াতের মুশরিকী আকীদা বিশ্বাস খণ্ডন করতে গিয়ে এ সত্যটির ওপর জোর দিয়ে থাকে যে, যাদেরকে তোমরা শাফায়াতকারী গণ্য করছো তারা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নয় এবং তাদের গোচরে ও অগোচরে যেসব কথা আছে আল্লাহ সেগুলো জানেন। এ থেকে একথা হৃদয়ংগম করানোই উদ্দেশ্য যে, তারা যখন প্রত্যেক মানুষের সামনের-পেছনেরও গোপন-

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

৩ রুকূ'

যারা (নবীর কথা মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে তারা কি চিন্তা করে না যে, এসব আকাশ ও পৃথিবী এক সাথে মিশে ছিল, তারপর আমি তাদেরকে আলাদা করলাম[২৮] এবং পানি থেকে সৃষ্টি করলাম প্রত্যেকটি প্রাণীকে।[২৯] তারা কি (আমার এ সৃষ্টি ক্ষমতাকে) মানে না ? আর আমি পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়ে দিয়েছি, যাতে সে তাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে[৩০] এবং তার মধ্যে চওড়া পথ তৈরি করে দিয়েছি,[৩১] হয়তো লোকেরা নিজেদের পথ জেনে নেবে।[৩২] আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ,[৩৩] কিন্তু তারা এমন যে, এ নিদর্শনাবলীর[৩৪] প্রতি দৃষ্টিই দেয় না। আর আল্লাহই রাত ও দিন তৈরি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই এক একটি কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।[৩৫]

প্রকাশ্য অবস্থা জানে না তখন তারা শাফায়াত করার একচ্ছত্র ও শর্তহীন অধিকার কেমন করে লাভ করতে পারে ? কাজেই ফেরেশতা, নবী, সৎলোক প্রত্যেকের শাফায়াত করার এখতিয়ার অবশ্য আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ। আল্লাহ তাঁদের কাউকে কোনো ব্যক্তির পক্ষে শাফায়াত করার অনুমতি দিলে তবেই তিনি তার পক্ষে শাফায়াত করতে পারবেন। নিজেই অগ্রণী হয়ে তাঁরা যে কোনো ব্যক্তির শাফায়াত করতে পারেন না। আর যখন শাফায়াত শোনা বা না শোনা এবং তা কবুল করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল তখন এ ধরনের ক্ষমতাহীন শাফায়াতকারীর সামনে মাথা নোয়ানো এবং প্রার্থনার হাত পাতা কিভাবে সমীচীন ও উপযোগী হতে পারে ? (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা ঃ ৮৫-৮৬ টীকা)

২৮. মূলে رتق ও فتق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'রত্‌ক' মানে হচ্ছে একত্র হওয়া, একসাথে থাকা, একজন অন্য জনের সাথে জুড়ে থাকা। আর "ফাত্‌ক" মানে

ফেড়ে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলা, আলাদা করা। বাহ্যত এ শব্দগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা' হচ্ছে এই যে, বিশ্ব-জাহান প্রথমে একটি পিণ্ডের (MASS) আকারে ছিল। পরবর্তীকালে তাকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা ইত্যাদি স্বতন্ত্র জগতে পরিণত করা হয়েছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ১৩, ১৪, ১৫ টীকা।)

২৯. এ থেকে যে অর্থ বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ পানিকে জীবনের উৎপাদক (Cause of life) ও প্রাণের উৎসে পরিণত করেছেন। এরি মধ্যে এবং এ থেকে করেছেন জীবনের সূচনা। কুরআনের অন্য জায়গায় এ বক্তব্যকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ

"আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা নূর ঃ ৪৫)

৩০. সূরা আন নাহল-এর ১২ টীকায় এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

৩১. অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্যে এমন গিরিপথ, ঝরণা ও নদী তৈরি করে দিয়েছি যার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করার ও পৃথিবীর এক অংশ থেকে আর এক অংশে চলাফেরা করার জন্য রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অংশকে এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যার ফলে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়ার পথ তৈরি হয়ে যায় বা তৈরি করে নেয়া যেতে পারে।

৩২. এটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য। এর এ অর্থও হয় যে, লোকেরা পৃথিবীতে চলাফেরা করার পথ পাবে, আবার এ অর্থও হয় যে, তারা এই জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, কলাকৌশল, কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা দেখে মূল সত্যে পৌঁছে যাবার পথ পাবে।

৩৩. ব্যাখ্যার জন্য সূরা আল হিজর ৮, ১০, ১১ ও ১২ টীকা দেখুন।

৩৪. অর্থাৎ আকাশে যে নিদর্শনগুলো আছে সেগুলোর দিকে।

৩৫. كُلٌّ ও يَسْبَحُوْنَ শব্দগুলোই একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এর অর্থ শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্র নয় বরং মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রও। নয়তো বহুবচনের পরিবর্তে একবচন ব্যবহার করা হতো। فَلَكٌ শব্দটি আমাদের ভাষায় চক্র শব্দের সমার্থক। আরবী ভাষায় এটি আসমান বা আকাশ শব্দের পরিচিত অর্থই প্রকাশ করে। "সবাই এক একটি ফালাকে (কক্ষপথে) সাঁতরে বেড়াচ্ছে"—এ থেকে দু'টি কথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। এক, প্রত্যেকের ফালাক বা কক্ষপথ আলাদা। দুই, ফালাক এমন কোনো জিনিস নয় যেখানে এ গ্রহ-নক্ষত্রগুলো খুঁটির মতো প্রোথিত আছে এবং তারা নিজেরাই এ খুঁটিগুলো নিয়ে ঘুরছে। বরং তারা কোনো প্রবহমান অথবা আকাশ ও মহাশূন্য ধরনের কোনো বস্তু যার মধ্যে এই গ্রহ-নক্ষত্রের চলা ও গতিশীলতা সাঁতার কাটার সাথে সামঞ্জস্য রাখে (আরো বেশী ব্যাখার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন ৩৭ টীকা দেখুন।)

প্রাচীন যুগে লোকদের কাছে আকাশ ও পৃথিবীর একত্র হওয়া (رتق) ও পৃথক হয়ে যাওয়া (فتق) পানি থেকে প্রত্যেক সজীব সত্তাকে সৃষ্টি করা এবং গ্রহ নক্ষত্রের এক একটি 'ফালাকে' সাঁতার কাটার ভিন্ন অর্থ ছিল। বর্তমান যুগে পদার্থবিদ্যা (Physics)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

আর[৩৬] (হে মুহাম্মাদ!) অনন্ত জীবন তো আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে দেইনি ; যদি তুমি মরে যাও তাহলে এরা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে ? প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।[৩৭] আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থার মধ্যে ফেলে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা করছি,[৩৮] শেষ পর্যন্ত তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।

এ সত্য অস্বীকারকারীরা যখন তোমাকে দেখে, তোমাকে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে। বলে, "এ কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা করে ?"[৩৯] অথচ তাদের নিজেদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা করুণাময়ের যিক্‌রের অস্বীকারকারী।[৪০]

জীববিদ্যা (Biology) ও জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy) অত্যাধুনিক তথ্যাবলী আমাদের কাছে তাদের অর্থ ভিন্নতর করে দিয়েছে। আমরা বলতে পারি না আগামীতে মানুষ যেসব তথ্য সংগ্রহ করবে তার ফলে এ শব্দগুলোর অর্থ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। মোট কথা বর্তমান যুগের মানুষ এ তিনটি আয়াতকে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক তথ্যাবলী অনুযায়ী পাচ্ছে।

এখানে একথাটি অনুধাবন করে নিতে হবে যে, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে নিয়ে كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত ভাষণে শিরক খণ্ডন করা হয়েছে এবং اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে নিয়ে فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার মধ্যে তাওহীদের জন্য ইতিবাচক (Positive) যুক্তি দেয়া হয়েছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, তোমাদের সামনে বিশ্ব-জাহানের এই যে ব্যবস্থা আছে, এর মধ্যে কি কোথাও এক আল্লাহ রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারো কোনো সৃষ্টি কৌশল তোমরা দেখতে পাচ্ছো ? একাধিক ইলাহদের কর্মকুশলতায় কি এ ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে এবং এমন শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে বিশ্ব-জাহান চলতে পারে ? এ জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাটি সম্পর্কে কি কোনো বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারেন যে, এটা একজন খেলোয়াড়ের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তিনি নিছক নিজের ফূর্তি ও আনন্দ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য কয়েকটি পুতুল বানিয়ে নিয়েছেন, কিছুক্ষণ খেলা করার পর আবার সেগুলো ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দেবেন ? এসব কিছু তোমরা নিজেদের

চোখে দেখছো এবং এরপরও নবীর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করছো ? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না, পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি জিনিস নবী তোমাদের সামনে যে তাওহীদী মতবাদ পেশ করছেন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ? এসব নিদর্শনের উপস্থিতিতে তোমরা বলছো فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ (এ নবী কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুক) নবী তাওহীদের দাওয়াতের পক্ষে সাক্ষ দেবার জন্য এ নিদর্শনগুলো কি যথেষ্ট নয় ?

৩৬. এখান থেকে আবার ভাষণের মোড় ঘুরে যাচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যে যে সংঘাত চলছিল সেদিকে।

৩৭. যে সমস্ত হুমকি ধমকি, বদদোয়া ও হত্যার ষড়যন্ত্রের সাহায্যে সর্বক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বাগত জানানো হতো এ হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত জবাব। একদিকে ছিল কুরাইশ নেতারা। তারা প্রতিদিন তাঁর এ প্রচার কার্যের জন্য তাঁকে হুমকি দিতে থাকতো এবং তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক বিরোধী আবার বসে বসে যে কোনোভাবে তাঁকে খতম করে দেবার কথাও ভাবতো। অন্যদিকে যে গৃহের কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করতো সে গৃহের সবাই তার শত্রু হয়ে যেতো। মেয়েরা দাঁতে দাঁত পিশে তাঁকে অভিশাপ দিতো ও বদদোয়া করতো। আর গৃহের পুরষরা তাঁকে ভয় দেখাতো। বিশেষ করে হাবশায় হিজরতের পরে মক্কার ঘরে ঘরে বিলাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ এমন একটি বাড়ি পাওয়া কঠিন ছিল যেখান থেকে একজন পুরুষ বা মেয়ে হিজরত করেনি। এরা সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে অভিযোগ করে বলতো, এ লোকটি আমাদের পরিবার ধ্বংস করে দিয়েছে। এসব কথার জবাব এ আয়াতে দেয়া হয়েছে এবং একই সংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, ওদের কোনো পরোয়া না করে তুমি নির্ভয়ে নিজের কাজ করে যাও।

৩৮. অর্থাৎ দুঃখ-আনন্দ, দারিদ্র-ধনাঢ্যতা, জয়-পরাজয়, শক্তিমত্তা-দুর্বলতা, সুস্থতা-রুগ্নতা ইত্যাদি সকল অবস্থায় তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে ভালো অবস্থায় তোমরা অহংকারী, জালেম, আল্লাহ বিস্মৃত ও প্রবৃত্তির দাস হয়ে যাও কিনা। খারাপ অবস্থায় হিম্মত ও সাহস কমে যাওয়ায় নিম্নমানের ও অবমাননাকর পদ্ধতি এবং অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে বসো কি না। কাজেই কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির এ রকমারী অবস্থা বুঝার ব্যাপারে ভুল করা উচিত নয়। সে যে অবস্থারই সম্মুখীন হোক, তাকে অবশ্যই পরীক্ষার এ দিকটি সামনে রাখতে হবে এবং সাফল্যের সাথে একে অতিক্রম করতে হবে। কেবলমাত্র একজন বোকা ও সংকীর্ণমনা লোকই ভাল অবস্থায় ফেরাউনে পরিণত হয় এবং খারাপ অবস্থা দেখা দিলে মাটিতে নাক-খত দিতে থাকে।

৩৯. অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে বিরূপ কথা বলে। এখানে আরো এতটুকু কথা বুঝে নিতে হবে যে, এ বাক্যটি তাদের বিদ্রুপের বিষয়বস্তু বর্ণনা করছে না বরং বিদ্রূপ করার কারণ ও ভিত্তিভূমির ওপর আলোকপাত করছে। একথা সুস্পষ্ট যে, এ বাক্যটি মূলত কোনো বিদ্রূপাত্মক বাক্য নয়। বিদ্রূপ তারা অন্যভাবে করে থাকবে এবং এজন্য কোনো অন্য ধরনের ধ্বনি দিয়েও বাক্য উচ্চারণ করে থাকবে, তবে তিনি তাদের মনগড়া উপাস্যদের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করতেন বলেই তারা এভাবে মনের ঝাল মিটাতো।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ
ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ
قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾

মানুষ দ্রুততাপ্রবণ সৃষ্টি।[৪১] এখনই আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি নিজের নিদর্শনাবলী, আমাকে তাড়াহুড়া করতে বলো না।[৪২]—এরা বলে, "এ হুমকি কবে পূর্ণ হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?" হায়! যদি এ কাফেরদের সেই সময়ের কিছু জ্ঞান থাকতো যখন এরা নিজেদের মুখ ও পিঠ আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না এবং এদেরকে কোথাও থেকে সাহায্যও করা হবে না। সে আপদ তাদের ওপর আকস্মিকভাবে এসে পড়বে এবং তাদেরকে হঠাৎ এমনভাবে চেপে ধরবে যে, তারা তার প্রতিরোধও করতে পারবে না। এবং মুহূর্তকালের অবকাশও লাভ করতে সক্ষম হবে না। তোমার পূর্বের রাসূলদেরকেও বিদ্রূপ করা হয়েছে কিন্তু বিদ্রূপকারীরা যা নিয়ে বিদ্রূপ করতো, শেষ পর্যন্ত তারই কবলে তাদেরকে পড়তে হয়েছে।

৪০. অর্থাৎ মূর্তি ও বানোয়াট ইলাহদের বিরোধিতা তাদের কাছে এত বেশী অপ্রীতিকর যে, এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তোমার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অবমাননা করে, কিন্তু তারা যে আল্লাহ বিমুখ এবং আল্লাহর নামোল্লেখে তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়, নিজেদের এ অবস্থার জন্য তাদের লজ্জাও হয় না।

৪১. মূলে خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হয়, "মানুষকে দ্রুততা প্রবণতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" কিন্তু এই শাব্দিক অর্থ বাক্যের উদ্দেশ্য নয়। আমরা যেমন নিজের ভাষায় বলি, অমুক ব্যক্তি জ্ঞানের সাগর এবং লোকটি পাষাণ হৃদয়, ঠিক তেমনি আরবী ভাষায় বলা হয়, তাকে অমুক জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর অর্থ হয়, অমুক জিনিসটি তার প্রকৃতিগত। এখানে خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ বলে যে অর্থ নেয়া হয়েছে অন্য জায়গায় وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا "মানুষ দ্রুততা প্রবণ প্রমাণিত হয়েছে" (বনী ইসরাঈল ঃ ১১) বলে সেই একই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ۭ بَلْ هُمْ عَنْ
ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ۭ
لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا
هٰٓؤُلَاۗءِ وَاٰبَاۗءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۭ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي
الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۭ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ
بِالْوَحْيِ ڮ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاۗءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, কে তোমাদের রাতে ও দিনে রহমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারে ?[৪৩] *কিন্তু তারা নিজেদের রবের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তাদের কাছে কি এমন কিছু ইলাহ আছে যারা আমার মুকাবিলায় তাদেরকে রক্ষা করবে ? তারা না নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে, না আমার সমর্থন লাভ করে। আসল কথা হচ্ছে, তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমি জীবনের উপায়-উপকরণ দিয়েই এসেছি। এমনকি তারা দিন পেয়ে গেছে।*[৪৪] *কিন্তু তারা কি দেখে না, আমি বিভিন্ন দিক থেকে পৃথিবীকে সংকুচিত করে আনছি ?*[৪৫] *তবুও কি তারা বিজয়ী হবে ?*[৪৬] *তাদেরকে বলে দাও, "আমি তো অহীর ভিত্তিতে তোমাদেরকে জানাচ্ছি"— কিন্তু বধিররা ডাক শুনতে পায় না, যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়।*

৪২. পরবর্তী ভাষণ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এখানে "নিদর্শনাবলী" বলতে কি বুঝাচ্ছে। তারা যেসব কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তার মধ্যে আল্লাহর আযাব, কিয়ামত ও জাহান্নামের বিবরণও ছিল। তারা বলতো, এ ব্যক্তি প্রতিদিন আমাদের ভয় দেখায়, বলে, আমাকে অস্বীকার করলে আল্লাহর আযাব আপতিত হবে, কিয়ামতে তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করা হবে। কিন্তু আমরা প্রতিদিন অস্বীকার করছি এবং হেসে কুঁদে বেড়াচ্ছি, কোনো আযাব আসতে দেখা যাচ্ছে না এবং কোনো কিয়ামতও হচ্ছে না। এ আয়াতগুলোয় এরই জবাব দেয়া হয়েছে।

৪৩. অর্থাৎ যদি রাতের বা দিনের কোনো সময় অকস্মাৎ আল্লাহর মহাপরাক্রমশালী হাত তোমাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে তাহলে তখন তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারে এমন শক্তিশালী সহায়ক ও সাহায্যকারী তোমাদের কে আছে ?

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا
ظَٰلِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَٰزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ
شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا
حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ
مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٠﴾

আর যদি তোমার রবের আযাব তাদেরকে সামান্য স্পর্শ করে যায়,[৪৭] তাহলে তারা তৎক্ষণাত চিৎকার দিয়ে উঠবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম।

কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওযন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম যুলুম হবে না। যার তিল পরিমাণও কোনো কর্ম থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যথেষ্ট।[৪৮]

পূর্বে[৪৯] আমি মূসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফুরকান, জ্যোতি ও 'যিকির'[৫০] এমনসব মুত্তাকীদের কল্যাণার্থে[৫১] যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং যারা (হিসেবে নিকেশের) সে সময়ের[৫২] ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। আর এখন এ বরকত সম্পন্ন যিকির আমি (তোমাদের জন্য) নাযিল করেছি। তবুও কি তোমরা একে মেনে নিতে অস্বীকার করো ?

৪৪. অর্থাৎ আমার এ মেহেরবানী ও প্রতিপালন থেকে তারা এ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে যে, এসব কিছু তাদের ব্যক্তিগত অধিকার এবং এগুলো ছিনিয়ে নেবার কেউ নেই। নিজেদের সমৃদ্ধি ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বকে তারা অক্ষয় ও চিরস্থায়ী মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে এমনই মত্ত হয়ে গেছে যে, তাদের মনে কখনো একথা একবারও জাগেনী যে, উপরে আল্লাহ বলে একজন আছেন, যিনি তাদের ভাঙা-গড়ার ক্ষমতা রাখেন।

৪৫. এ বিষয়টি ইতিপূর্বে সূরা রা'আদের ৪১ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করেছি (দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা রা'আদ, ৬০ টীকা)। এখানে এ প্রেক্ষাপটে এটি অন্য একটি অর্থ প্রকাশ করছে। সেটি হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর চারদিকে

একটি বিজয়ী ও পরাক্রান্ত শক্তির কর্মতৎপরতার নিদর্শনাবলী দেখতে পাওয়া যায়। অকস্মাৎ কখনো দুর্ভিক্ষ, কখনো বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী, আবার কখনো প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড গরম এবং কখনো অন্য কিছু দেখা দেয়। এভাবে আকস্মিক বিপদ-আপদ মানুষের সমস্ত কীর্তি ও কর্মকাণ্ড ধ্বংস করে দিয়ে যায়। হাজার হাজার, লাখো লাখো লোক মারা যায়। জনবসতী ধ্বংস হয়ে যায়। সবুজ শ্যামল শস্য ক্ষেতগুলো বিধ্বস্ত হয়। উৎপাদন কমে যায়। ব্যবসায় বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়। মোট কথা মানুষের জীবন ধারণের উপায় উপকরণের কখনো এদিক থেকে আবার কখনো ওদিক থেকে ঘাটতি দেখা দেয়। নিজের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করেও মানুষ এ ক্ষতির পথ রোধ করতে পারে না। (আরো বেশী ব্যাখার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা আস সাজদাহ ৩৩ টীকা)

৪৬. অর্থাৎ যখন তাদের সমস্ত জীবনোপকরণ আমার হাতে রয়েছে, আমি যে জিনিসটি চাই কমিয়ে দিতে পারি, যেটি চাই বন্ধ করে দিতে পারি, সে ক্ষেত্রে তারা কি আমার মোকাবিলায় বিজয়ী হবার এবং আমার পাকড়াও থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার ক্ষমতা রাখে ? এ নিদর্শনাবলী কি তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করে যে, তাদের শক্তি চিরস্থায়ী, তাদের আয়েশ-আরাম কোনোদিন নিশেষিত হবে না এবং তাদেরকে পাকড়াও করার কেউ নেই ?

৪৭. সে আযাব যা দ্রুত নিয়ে আসার জন্য তারা জোরেশোরে দাবি জানাচ্ছে এবং বিদ্রূপের স্বরে বলছে, নিয়ে এসো সেই আযাব, কেন তা আমাদের ওপর নেমে আসছে না ?

৪৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আ'রাফ ৮-৯টীকা। এই দাঁড়িপাল্লা কোন ধরনের হবে তা অনুধাবন করা আমাদের জন্য কঠিন। মোটকথা সেটি এমন কোনো জিনিস হবে, যা বস্তু ওজন করার পরিবর্তে মানুষের নৈতিক গুণাবলী, কর্মকাণ্ড ও তার পাপ-পুণ্য ওজন করবে এবং যথাযথ ওজন করার পর নৈতিক দিক দিয়ে কোন্ ব্যক্তি কোন্ ধরনের মর্যাদার অধিকারী তা জানিয়ে দেবে। পুণ্যবান হলে কি পরিমাণ পুণ্যবান এবং পাপী হলে কি পরিমাণ পাপী। মহান আল্লাহ এর জন্যে আমাদের ভাষার অন্যান্য শব্দ বাদ দিয়ে "দাঁড়িপাল্লা" শব্দ এ জন্য নির্বাচিত করেছেন যে, এর ধরনটি হবে দাঁড়িপাল্লার সাথে সাঞ্জস্যশীল অথবা এ নির্বাচনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, একটি দাঁড়িপাল্লার পাল্লাহ্ যেমন দুটি জিনিসের ওজনের পার্থক্য সঠিকভাবে জানিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি আমার ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লাহও প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের কাজকর্ম যাচাই করে কোনো প্রকার কমবেশী না করে তার মধ্যে পুণ্যের না পাপের কোন দিকটি প্রবল তা একদম হুবহু বলে দেয়।

৪৯. এখান থেকে নবীদের আলোচনা শুরু হয়েছে। একের পর এক বেশ কয়েক জন নবীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যে প্রেক্ষাপটে এ আলোচনা এসেছে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত কথাগুলো অনুধাবন করানোই যে এর উদ্দেশ্য তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

এক ঃ পূর্বের সকল নবীই মানুষ ছিলেন, তাঁরা কোনো অভিনব সৃষ্টি ছিলেন না। একজন মানুষকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, ইতিহাসে আজ এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫ রুকূ'

এরও আগে আমি ইবরাহীমকে শুভ বুদ্ধি ও সত্যের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তাকে খুব ভালোভাবেই জানতাম।[৫৩] সে সময়ের কথা স্মরণ করো[৫৪] যখন, সে তার নিজের বাপকে ও জাতিকে বলেছিল ঃ "এ মূর্তিগুলো কেমন, যেগুলোর প্রতি তোমরা ভক্তিতে গদগদ হচ্ছো ?" তারা জবাব দিল ঃ "আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা এদের ইবাদাতরত অবস্থায় পেয়েছি।" সে বললো, "তোমরাও পথভ্রষ্ট এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই অবস্থান করছিল।" তারা বললো, "তুমি কি আমাদের সামনে তোমার প্রকৃত মনের কথা বলছো, না নিছক কৌতুক করছো ?"[৫৫]

দুই ঃ আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ করছেন পূর্বে নবীগণও সেই একই কাজ করতে এসেছিলেন। এটিই ছিল তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা।

তিন ঃ নবীদের সংগে আল্লাহ বিশেষ ব্যবহার করেন ও বিশেষ সম্পর্ক রাখেন। তারা বড় বড় বিপদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেন। বছরের পর বছর বিপদের মুখোমুখি হতে থাকেন। একক ও ব্যক্তিগত বিপদে এবং বিরোধীদের সৃষ্ট বিপদেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা লাভ করেন। তিনি তাঁদের প্রতি নিজের রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। তাঁদের দোয়া কবুল করেন ও কষ্ট দূর করেন। তাঁদের বিরোধীদেরকে পরাজিত করেন এবং অলৌকিক পদ্ধতিতে তাঁদেরকে সাহায্য করেন।

চার ঃ মহান আল্লাহর প্রিয়তম ও তাঁর দরবারে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর পক্ষ থেকে বড় বড় বিস্ময়কর ক্ষমতা লাভ করার পরও তাঁরা ছিলেন বান্দা ও মানুষই। তাঁদের কেউই খোদায়ী কর্তৃত্বের অধিকারী হননি। মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা ভুলও করতেন। রোগগ্রস্তও হয়ে পড়তেন। পরীক্ষায়ও তাঁদের ফেলা হতো। এমনকি ভুলচুকও তাঁদের দ্বারা হয়ে যেতো। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে শুধরে দেয়া হতো।

৫০. এ তিনটি শব্দের মাধ্যমে তাওরাতের পরিচয় দান করা হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাত ছিল হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী মানদণ্ড, মানুষকে সত্য-সরল পথ দেখাবার আলোকবর্তিকা এবং মানব জাতিকে তার বিস্মৃত পাঠ স্মরণ করিয়ে দেবার উপদেশ।

৫১. অর্থাৎ যদিও তা পাঠানো হয়েছিল সমগ্র মানব জাতির জন্য কিন্তু তা থেকে কার্যত লাভবান তারাই হতে পারতো যারা ছিল এসব গুণে গুণান্বিত।

৫২. যার আলোচনা এই মাত্র উপরে করা হলো অর্থাৎ কিয়ামত।

৫৩. আমি এখানে "رشـد" শব্দের অনুবাদ করেছি "শুভবুদ্ধি ও সত্যের জ্ঞান" রুশদ এর অর্থ হচ্ছে সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করে সঠিক কথা বা পথ অবলম্বন করা এবং বেঠিক কথা ও পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া। এ অর্থের প্রেক্ষিতে "রুশদ" এর অনুবাদ "সত্যনিষ্ঠা"ও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু রুশ্‌দ শব্দটি কেবলমাত্র সত্যনিষ্ঠা নয় বরং এমন সত্যজ্ঞানের ভাব প্রকাশ করে যা হয় সঠিক চিন্তা ও ভারসাম্যপূর্ণ সুষ্ঠ বুদ্ধি ব্যবহারের ফলশ্রুতি তাই আমি "শুভবুদ্ধি ও সত্যের জ্ঞান" এই দু'টি শব্দকে একত্রে এর অর্থের কাছাকাছি পেয়েছি।

"ইবরাহীমকে তার সত্যজ্ঞান ও শুভবুদ্ধি দান করেছিলাম।" অর্থাৎ সে যে সত্যের জ্ঞান ও শুভবুদ্ধির অধিকারী ছিল তা আমিই তাকে দান করেছিলাম।

"আমি তাকে খুব ভালোভাবে জানতাম।" অর্থাৎ আমি চোখ বন্ধ করে তাকে এ দান করিনি। আমি জানতাম সে কেমন লোক। সব জেনেশুনেই তাকে দান করেছিলাম। اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ "আল্লাহ ভালো জানেন নিজের রিসালাত কাকে সোপর্দ করবেন।" (আনআম ঃ ১২৪) এর মধ্যে কুরাইশ সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যে আপত্তি করতো তার প্রতি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে। তারা বলতো এ ব্যক্তির মধ্যে এমন কি অসাধারণ বৈশিষ্ট আছে যে, আল্লাহ আমাদের বাদ দিয়ে তাকেই রিসালাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন ? এর জবাব কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেয়া হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র এতটুকু সূক্ষ্ম ইংগিত করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্ন ইবরাহীম সম্পর্কেও হতে পারতো। বলা যেতে পারতো যে, সারা ইরাক দেশে একমাত্র ইবরাহীমকেই কেন এ অনুগ্রহে অভিসিক্ত করা হলো ? কিন্তু আমি জানতাম ইবরাহীমের মধ্যে কি যোগ্যতা আছে। তাই তার সমগ্র জাতির মধ্য থেকে একমাত্র তাকেই এ অনুগ্রহ দান করার জন্য বাছাই করা হয়।

ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পবিত্র সীরাতের বিভিন্ন দিক সূরা বাকারার ১২৪ থেকে ১৪১ ও ২৫৮ থেকে ২৬০, আন'আমের ৭৪ থেকে ৮১, তওবার ১১৪, হূদের ৬৯ থেকে ৭৪, ইবরাহীমের ৩৫ থেকে ৪১, আল হিজরের ৫১ থেকে ৬০ এবং আন নহ্‌লের ১২০ থেকে ১২৩ আয়াতে আলোচিত হয়ছে। এর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো হবে।

৫৪. সামনের দিকে যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, তা পড়ার আগে একথাগুলো মনের মধ্যে তাজা করে নিতে হবে যে, কুরাইশরা হযরত ইবরাহীমের সন্তান ছিল। কাবাঘর তিনিই নির্মাণ করেছিলন। সারা আরবে কাবার কেন্দ্রীয় ভূমিকা তাঁর সাথে সম্পর্কের কারণেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ইবরাহীমের আওলাদও ইবরাহিমী কাবার খাদেম হবার

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِیْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ ﴿۵۶﴾ وَتَاللّٰهِ لَاَكِیْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِیْنَ ﴿۵۷﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِیْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَیْهِ یَرْجِعُوْنَ ﴿۵۸﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَاۤ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۵۹﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًی یَّذْكُرُهُمْ یُقَالُ لَهٗۤ اِبْرٰهِیْمُ ﴿۶۰﴾ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰۤی اَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُوْنَ ﴿۶۱﴾

সে জবাব দিল, "না, বরং আসলে তোমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব এবং এদের স্রষ্টা। এর স্বপক্ষে আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ দিচ্ছি। আর আল্লাহর কসম, তোমাদের অনুপস্থিতিতে আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।"[৫৬] সে অনুসারে সে সেগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললো[৫৭] এবং শুধুমাত্র বড়টিকে ছেড়ে দিল, যাতে তারা হয়তো তার দিকে ফিরে আসতে পারে।[৫৮] (তারা এসে মূর্তিগুলোর এ অবস্থা দেখে) বলতে লাগলো, "আমাদের ইলাহদের এ অবস্থা করলো কে, বড়ই জালেম সে।"

(কেউ কেউ) বললো, "আমরা এক যুবককে এদের কথা বলতে শুনেছিলাম, তার নাম ইবরাহীম।" তারা বললো, "তাহলে তাকে ধরে নিয়ে এসো সবার সামনে, যাতে লোকেরা দেখে নেয়" (কিভাবে তাকে শাস্তি দেয়া হয়)।[৫৯]

কারণেই কুরাইশরা যাবতীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। আজ এ যুগে এবং আরবের বহু দূরবর্তী এলাকার পরিবেশে হযরত ইবরাহীমের এ কাহিনী শুধুমাত্র একটি শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবেই দেখা যায় কিন্তু যে যুগে ও পরিবেশে প্রথম প্রথম একথা বলা হয়েছিল, তা দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে অনুভূত হবে যে, করাইশদের ধর্ম ও তাদের পৌরহিত্যের ওপর এটা এমন একটা তীক্ষ্ণ কশাঘাত ছিল, যা একেবারে তার মর্মমূলে আঘাত হানতো।

৫৫. এ বাক্যটির শাব্দিক অনুবাদ হবে, 'তুমি কি আমাদের সামনে সত্য পেশ করছো, না খেলা করছো ?" কিন্তু এর আসল অর্থ ওটাই যা উপরে অনুবাদে বলা হয়েছে। নিজেদের ধর্মের সত্যতার প্রতি তাদের বিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, তারা গুরুত্ব সহকারে কেউ একথা বলতে পারে বলে কল্পনাও করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা বললো, তুমি নিছক ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও খেলা-তামাশা করছো, না কি প্রকৃতপক্ষে এটাই তোমার চিন্তাধারা ?

قَالُوٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۞ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۞ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ۞

(ইবরাহীমকে নিয়ে আসার পর) তারা জিজ্ঞেস করলো, "ওহে ইবরাহীম! তুমি কি আমাদের ইলাহদের সাথে এ কাণ্ড করেছো?" সে জবাব দিল, "বরং এসব কিছু এদের এ সরদারটি করেছে, এদেরকেই জিজ্ঞেস করো, যদি এরা কথা বলতে পারে।"[৬০] একথা শুনে তারা নিজেদের বিবেকের দিকে ফিরলো এবং (মনে মনে) বলতে লাগলো, "সত্যিই তোমরা নিজেরাই যালেম।" কিন্তু আবার তাদের মত পাল্টে গেলো[৬১] এবং বলতে থাকলো, "তুমি জানো, এরা কথা বলে না।"

৫৬. অর্থাৎ যদি তোমরা যুক্তির সাহায্যে কথা বুঝতে অপারগ হয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাদেরকে কার্যত দেখিয়ে দেবো যে, এরা অসহায়, সামান্যতম ক্ষমতাও এদের নেই এবং এদেরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে একথা তাদের সামনে কেমন করে প্রমাণ করবেন, এর কোনো বিস্তারিত বিবরণ হযরত ইবরাহীম (আ) এ সময় দেননি।

৫৭. অর্থাৎ যে সময় পূজারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারীরা উপস্থিত ছিল না সে সময় সুযোগ পেয়েই হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের কেন্দ্রীয় ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন এবং মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেললেন।

৫৮. "তার দিকে" কথাটির মধ্যে যে ইংগিত রয়েছে তা বড় মূর্তিটির দিকেও হতে পারে আবার হযরত ইবরাহীমের দিকেও। যদি প্রথমটি হয় তাহলে এটি হবে হযরত ইবরাহীমের পক্ষ থেকে তাদের আকীদা বিশ্বাসের প্রতি একটি বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষের সমার্থক। অর্থাৎ যদি তারা মনে করে থাকে সত্যিই এরা ইলাহ, তাহলে তাদের এ বড় ইলাহটির ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া উচিত যে, সম্ভবত বড় ইলাহ কোনো কারণে ছোট ইলাহদের প্রতি বিরূপ হয়ে গিয়ে তাদের সবাইকে কচুকাটা করে ফেলেছেন। অথবা বড় ইলাহটিকে জিজ্ঞেস করো যে, হুযুর! আপনার উপস্থিতিতে একি ঘটে গেলো? কে এ কাজ করলো? আপনি তাকে বাধা দিলেন না কেন? আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, এ কাজের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীমের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, নিজেদের মূর্তিগুলোর এ দুরবস্থা দেখে হয়তো তাদের দৃষ্টি আমার দিকে ফিরে আসবে এবং তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তখন তাদের সাথে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলার সুযোগ আমি পেয়ে যাবো।

৫৯. এভাবে হযরত ইবরাহীমের মনের আশাই যেন পূরণ হলো। কারণ তিনি এটাই চাচ্ছিলেন। ব্যাপারটিকে তিনি শুধু পুরোহিত ও পূজারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছিলেন না। বরং তিনি চাচ্ছিলেন, ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ুক। তারাও আসুক, দেখে নিক এই যে মূর্তিগুলোকে তাদের অভাব পূরণকারী হিসেবে রাখা হয়েছে এরা কতটা অসহায় এবং স্বয়ং পুরোহিতরাই এদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে। এভাবে এ পুরোহিতরাও ফেরাউনের মতো একই ভুল করলো। ফেরাউন যাদুকরদের সাথে হযরত মূসা (আ)-কে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করার জন্য সারা দেশের মানুষকে একত্র করেছিল, এরাও হযরত ইবরাহীমের মামলা শোনার জন্য সারা দেশের মানুষকে একত্র করলো। সেখানে হযরত মূসা সবার সামনে একথা প্রমাণ করার সযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি যা কিছু এনেছেন তা যাদু নয় বরং মু'জিযা। এখানে হযরত ইবরাহীমকেও তাঁর শত্রুরাই সুযোগ দিয়ে দিল যেন জনগণের সামনে তাদের ধোঁকাবাজীর তেলেসমাতি ছিন্নভিন্ন করতে পারেন।

৬০. এ শেষ বাক্যটি স্বতই একথা প্রকাশ করছে যে, প্রথম বাক্যে হযরত ইবরাহীম মূর্তি ভাঙ্গার দায় যে বড় মূর্তিটির ঘাড়ে চাপিয়েছেন, তার দ্বারা মিথ্যা বলা তার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তিনি নিজের বিরোধীদেরকে প্রমাণ দর্শাতে চাচ্ছিলেন। তারা যাতে জবাবে নিজেরাই একথা স্বীকার করে নেয় যে, এ উপাস্যরা একেবারেই অসহায় এবং এদের দ্বারা কোনো উপকারের আশাই করা যায় না। তাই তিনি একথা বলেছিলেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য যে বাস্তব ঘটনা বিরোধী কথা বলে তাকে মিথ্যা গণ্য করা যেতে পারে না। কারণ মিথ্যা বলার নিয়তে সে এমন কথা বলে না এবং তার বিরোধীও একে মিথ্যা মনে করে না। বক্তা প্রমাণ নির্দেশ করার জন্য একথা বলে এবং শ্রোতাও একে সেই অর্থেই গ্রহণ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে হাদীসের এক বর্ণনায় একথা এসেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর জীবনে তিনবার মিথ্যা কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে এটি একটি "মিথ্যা।" দ্বিতীয় "মিথ্যা" হচ্ছে, সূরা সাফ্ফাতে হযরত ইবরাহীমের اِنِّىْ سَقِيْمٌ কথাটি। আর তৃতীয় "মিথ্যাটি" হচ্ছে তাঁর নিজের স্ত্রীকে বোন বলে পরিচিত করানো। একথাটি কুরআনে নয় বরং বাইবেলের আদি পুস্তকে বলা হয়েছে। এক শ্রেণীর বিদ্বানদের "রেওয়ায়াত" প্রীতির ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, তাদের কাছে বুখারী ও মুসলিমের কতিপয় বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতাই বেশী প্রিয় এবং এর ফলে যে একজন নবীর ওপর মিথ্যা বলা অভিযোগ আরোপিত হচ্ছে, তার কোনো পরোয়াই তাদের নেই। অপর একটি শ্রেণী এই একটিমাত্র হাদীসকে ভিত্তি করে সমগ্র হাদীস শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা শুরু করে দেয় এবং বলতে থাকে, সমস্ত হাদীসের স্তুপ উঠিয়ে দূরে ছুঁড়ে দাও। কারণ এর মধ্যে যতো আজেবাজে ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। অথচ কোনো একটি বা কতিপয় হাদীসের মধ্যে কোনো ত্রুটি পাওয়া যাবার কারণে সমস্ত হাদীস অনির্ভরযোগ্য হয়ে যাবে—এমন কোনো কথা হতে পারে না। আর হাদীস শাস্ত্রের দৃষ্টিতে কোনো হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা মজবুত হওয়ার ফলে এটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে না যে, তার "মতন" (মূল হাদীস) যতই আপত্তিকর হোক না কেন তাকে চোখ বন্ধ করে "সহী" বলে মেনে নিতে হবে। বর্ণনা পরম্পরা সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হবার পরও এমন অনেক কারণ থাকতে পারে, যার

ফলে একটি "মতন" ত্রুটিপূর্ণ আকারে উদ্ধৃত হয়ে যায় এবং এমন সব বিষয়বস্তু সম্বলিত হয় যে, তা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, একথাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নিসৃত হতে পারে না। তাই সনদ তথা বর্ণনা পরম্পরার সাথে সাথে "মতন"-ও দেখা অপরিহার্য। যদি মতনের মধ্যে সত্যিই কোনো দোষ থেকে থাকে তাহলে এরপরও অযথা তার নির্ভুলতার ওপর জোর দেয়া মোটেই ঠিক নয়।

যে হাদীসটিতে হযরত ইবরাহীমের তিনটি "মিথ্যা কথা" বর্ণনা করা হয়েছে সেটি কেবলমাত্র এ কারণে আপত্তিকর নয় যে, এটি একজন নবীকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছে বরং এ কারণেও এটি ত্রুটিপূর্ণ যে, এখানে যে তিনটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেগুলো সবই বিতর্কিত। এর মধ্যে একটি "মিথ্যার" অবস্থা তো পাঠক এইমাত্র দেখলেন। সামান্য বুদ্ধি জ্ঞানও যার আছে তিনি কখনো এই প্রেক্ষাপটে হযরত ইবরাহীমের এই বক্তব্যকে "মিথ্যা" বলে আখ্যায়িত করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নাউযুবিল্লাহ আমরা এমন ধারণা তো করতেই পারি না যে, তিনি এই বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝবেন না এবং খামাখাই একে মিথ্যা ভাষণ বলে আখ্যায়িত করবেন। আর إِنِّي سَقِيمٌ সংক্রান্ত ঘটনাটির ব্যাপারে বলা যায়, এটিকে মিথ্যা প্রমাণ করা যেতে পারে না যতক্ষণ না একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম সে সময় সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল, রোগমুক্ত ছিলেন এবং তিনি সামান্যতম অসুস্থতায়ও ভুগছিলেন না। একথা কুরআনে কোথাও বলা হয়নি এবং আলোচ্য হাদীসটি ছাড়া আর কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসেও এ আলোচনা আসেনি। এখন বাকী থাকে স্ত্রীকে বোন বলার ঘটনাটি। এ ব্যাপরটি এত বেশী উদ্ভট যে, কাহিনীটি শোনার পর কোনো ব্যক্তি প্রথমেই বলে বসবে এটা কোনো ঘটনাই হতে পারে না। এটি বলা হচ্ছে তখনকার কাহিনী যখন হযরত ইবরাহীম নিজের স্ত্রী সারাকে নিয়ে মিসরে যান। বাইবেলের বর্ণনামতে তখন হযরত ইবরাহীমের বয়স ৭৫ বছর ও হযরত সারার বয়স ৬৫ বছরের কিছু বেশী ছিল। এ বয়সে হযরত ইবরাহীম ভীত হলেন মিসরের বাদশাহ এ সুন্দরীকে লাভ করার জন্য তাঁকে হত্যা করবেন। কাজেই তিনি স্ত্রীকে বললেন, যখন মিসরীয়রা তোমাকে ধরে বাদশাহর কাছে নিয়ে যেতে থাকবে তখন তুমি আমাকে নিজের ভাই বলবে এবং আমিও তোমাকে বোন বলবো, এর ফলে আমি প্রাণে বেঁচে যাবো। (আদি পুস্তক ঃ ১২ অধ্যায়) হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যাটির ভিত্তি এই সুস্পষ্ট বাজে ও উদ্ভট ইসরাঈলী বর্ণনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে হাদীসের 'মতন' এ ধরনের উদ্ভট বক্তব্য সম্বলিত তাকেও আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি বলে মেনে নেবো কেমন করে—তা তার 'সনদ' যতই ত্রুটিমুক্তি হোক না কেন ? এ ধরনের একপেশে চিন্তা বিষয়টিকে বিকৃত করে অন্য এক বিভ্রান্তির উদ্ভট ঘটায় যার প্রকাশ ঘটাচ্ছে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠী। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন আমার লিখিত বই রাসায়েল ও মাসায়েল ২ খণ্ড , কতিপয় হাদীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তার জবাব নিবন্ধের ১২ নং জবাব)

৬১. মূলে نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ (মাথা নিচের দিকে উলটিয়ে দেয়া হলো) বলা হয়েছে । কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, তারা লজ্জায় মাথা নত করলো। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি ও বর্ণনা ভংগী এ অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। বক্তব্য পরম্পরা ও বক্তব্যের ধরনের প্রতি নজর দিলে যে সঠিক অর্থটি পরিষ্কার বুঝা যায় সেটি হচ্ছে এই যে,

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

ইবরাহীম বললো, "তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব জিনিসের পূজা করছো যারা তোমাদের না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি? ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যের তোমরা পূজা করছো তাদেরকে। তোমাদের কি একটুও বুদ্ধি নেই?" তারা বললো, "পুড়িয়ে ফেলো একে এবং সাহায্য করো তোমাদের উপাস্যদেরকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।" আমি বললাম ঃ "হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য।"[৬২] তারা চাচ্ছিল ইবরাহীমের ক্ষতি করতে, কিন্তু আমি তাদেরকে ভীষণভাবে ব্যর্থ করে দিলাম। আর আমি তাকে ও লূতকে[৬৩] বাঁচিয়ে এমন দেশের দিকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য বরকত রেখেছিলাম।[৬৪]

হযরত ইবরাহীমের জবাব শুনে প্রথমেই তারা মনে মনে ভাবলো, প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই তো জালেম। কেমন অসহায় ও অক্ষম দেবতাদেরকে তোমরা ইলাহ বানিয়ে নিয়েছো, যারা নিজমুখে তাদের ওপর কি ঘটে এবং কে তাদেরকে ভেঙ্গে চুরে রেখে দিয়েছে একথা বলতে পারে না। যারা নিজেরা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে না তারা তোমাদেরকে কিভাবে বাঁচাবে। কিন্তু এর পরপরই আবার তাদের ওপর জিদ ও মূর্খতা চড়াও হয়ে গেলো এবং জিদের বৈশিষ্ট অনুযায়ী তা চড়াও হবার সাথে সাথেই তাদের বুদ্ধি উল্টোমুখী হয়ে গেলো। মস্তিষ্ক সোজা ও সঠিক চিন্তা করতে করতে হঠাৎ উল্টো চিন্তা করতে আরম্ভ করলো।

৬২. শব্দাবলী পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে এবং পূর্বাপর বক্তব্যও এ অর্থ সমর্থন করছে যে, তারা সত্যিই তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। অন্যদিকে আগুনের কুণ্ড তৈরি হয়ে যাবার পর তারা যখন হযরত ইবরাহীমকে তার মধ্যে ফেলে দেয় তখন মহান আল্লাহ আগুনকে হুকুম দেন সে যেন ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং তাঁর কোনো ক্ষতি না করে। বস্তুত কুরআনে সুস্পষ্টভাবে যেসব মু'জিযার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এটিও তার অন্তরভুক্ত। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এ মু'জিযাগুলোকে সাধারণ ঘটনা প্রমাণ করার জন্য জোড়াতালি

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾
وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ
وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَلُوْطًا
اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ
الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ
اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

আর তাকে আমি ইসহাককে দান করলাম এবং এর ওপর অতিরিক্ত ইয়াকুব[৬৫] এবং প্রত্যেককে করলাম সৎকর্মশীল। আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথনির্দেশনা দিতো এবং আমি তাদেরকে অহীর মাধ্যমে সৎকাজের, নামায কায়েম করার ও যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং তারা আমার ইবাদাত করতো।[৬৬]

আর লূতকে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম[৬৭] এবং তাকে এমন জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা বদ কাজে লিপ্ত ছিল—আসলে তারা ছিল বড়ই দুরাচারী পাপিষ্ঠ জাতি—আর লূতকে আমি নিজের রহমতের আওতায় নিয়ে নিয়েছিলাম, সে ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত।

দিয়ে কৃত্রিম ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, তবে বুঝতে হবে যে, তার মতে আল্লাহর জন্যও বিশ্ব-জাহানের প্রচলিত নিয়মের বাইরে অস্বাভাবিক কোনো কিছু করা সম্ভবপর নয়। যে ব্যক্তি এরূপ মনে করে, আমি জানতে চাই যে, সে আল্লাহকে মেনে নেয়ার কষ্টই বা করতে যাচ্ছে কেন ? আর যদি সে এ ধরনের জোড়াতালির ব্যাখ্যা এ জন্য করে থাকে যে, আধুনিক যুগের তথাকথিত যুক্তিবাদীরা এ ধরনের কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, তাহলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি, জনাব! তথাকথিত সেসব যুক্তিবাদীকে যে কোনোভাবেই হোক স্বীকার করাতেই হবে, এ দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে কে চাপিয়ে দিয়েছিল ? কুরআন যেমনটি আছে ঠিক তেমনিভাবে যে তাকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন। তার স্বীকৃতি আদায় করার জন্য কুরআনকে তার চিন্তাধারা অনুযায়ী ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করা, যখন কুরআনের মূল বক্তব্যে প্রতিটি শব্দ এ ঢালাইয়ের বিরোধিতা করছে, তখন এটা কোন্ ধরনের প্রচার এবং কোন্ বিবেকবান ব্যক্তি একে বৈধ মনে করতে পারে ? (বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আনকাবুত ৩৯ টীকা)

৬৩. বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী নাহূরা ও হারান নামে হযরত ইবরাহীমের দুই ভাই ছিল। হযরত লূত ছিলেন হারানের ছেলে। (আদি পুস্তক ১১ঃ২৬) সূরা আনকাবুতে হযরত ইবরাহীমের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বাহ্যত একথাই জানা যায় যে, তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একমাত্র হযরত লূতই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। (দেখুন ২৬ আয়াত)

৬৪. অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তরভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোনো এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভূত হয়নি।

৬৫. অর্থাৎ ছেলের পরে পৌত্রকেও নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছি।

৬৬. বাইবেলে হযরত ইবরাহীমের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কোনো উল্লেখ নেই। বরং তাঁর জীবনের ইরাকী যুগের কোনো ঘটনাই এ গ্রন্থে স্থান পেতে পারেনি। নমরূদের সাথে তাঁর মুখোমুখি সংঘাত, পিতা ও সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অগ্নিতে নিক্ষেপের ঘটনা এবং সবশেষে দেশ ত্যাগে বাধ্য হওয়া— এসবের কোনোটিই বাইবেলের আদিপুস্তক লেখকের দৃষ্টিগ্রাহ্য হবার যোগ্যতা লাভ করেনি। তিনি কেবলমাত্র তাঁর দেশ ত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাও এমন ভংগীতে যেমন একটি পরিবার পেটের ধান্দায় এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে। কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনায় এর চাইতেও মজার যে পার্থক্য তা হচ্ছে এই যে, কুরআনের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীমের মুশরিক পিতা তাঁর প্রতি জুলুম করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে বাইবেল বলে, তাঁর পিতা নিজেই পুত্র, পৌত্র ও পুত্রবধূদেরকে নিয়ে হারানে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে। (আদি পুস্তক ১১ ঃ ৭-৩২) তারপর অকস্মাত একদিন আল্লাহ হযরত ইবরাহীমকে বলেন, "তুমি হারান ত্যাগ করে কেনানে গিয়ে বসবাস করো এবং "আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব। যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে তাহাকে আমি অভিশাপ দিব ; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" (১২ ঃ ১-৩) বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ হযরত ইবরাহীমের প্রতি বাইবেল প্রণেতার এমন অনুগ্রহ দৃষ্টি কেমন করে হলো ?

অবশ্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত ইবরাহীমের জীবনের ইরাকী যুগের যে বিস্তারিত ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে তালমূদে তার বেশীর ভাগ আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু উভয় বর্ণনা একত্র করলে শুধুমাত্র কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশেই পার্থক্য দেখা যাবে না বরং একথা পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, তালমূদের বর্ণনা বহু স্থানে বেখাপ্পা এবং বাস্তবতা ও যুক্তি বিরোধী। অন্যদিকে কুরআন একদম পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীনভাবে হযরত ইবরাহীমের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী পেশ করে। সেখানে কোনো অর্থহীন ও আজেবাজে কথা নেই। বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য আমি এখানে তালমূদের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার পেশ করছি। এর ফলে যারা কুরআনকে বাইবেল ও ইহুদীবাদী সাহিত্যের চর্বিতচর্বণ গণ্য করে থাকেন তাদের বিভ্রান্তির ধূম্রজাল বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

তালমূদের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীমের জন্মদিনে জ্যোতিষীরা আকাশে একটি আলামত দেখে তারেহ-এর গৃহে যে শিশুর জন্ম হয়েছে তাকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। তদনুসারে সে তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তারেহ নিজের ক্রীতদাসের পুত্রকে তার বিনিময়ে প্রদান করে তাকে বাঁচায়। এরপর তারেহ নিজের স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে একটি পর্বত গুহায় লুকিয়ে রাখে। সেখানে তারা দশ বছর অবস্থান করে। এগার বছর বয়সে হযরত ইবরাহীমকে সে হযরত নূহের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি হযরত নূহ ও তাঁর পুত্র সামের তত্বাবধানে বাস করতে থাকেন। এ সময়ে হযরত ইবরাহীম তাঁর আপন ভাইয়ের মেয়ে সারাহকে বিয়ে করেন। সারাহ তাঁর চেয়ে বয়সে ৪২ বছরের ছোট ছিল। (বাইবেল একথা স্পষ্ট করে বলেনি যে, সারাহ হযরত ইবরাহীমের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। তাছাড়া বাইবেলের বর্ণনা মতে তাদের উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল দশ বছরের। আদি পুস্তক ১১ ঃ ২৯ এবং ১৭ ঃ ১৭)

তারপর তালমূদ বলছে, হযরত ইবরাহীম পঞ্চাশ বছর বয়সে হযরত নূহের গৃহ ত্যাগ করে নিজের পিতার গৃহে চলে আসেন। এখানে তিনি দেখেন পিতা মূর্তিপূজারী এবং গৃহে বারো মাসের হিসেবে বারোটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি প্রথমে পিতাকে বুঝাবার চেষ্টা করেন। তাকে বুঝাতে অক্ষম হয়ে একদিন ঘরোয়া মূর্তি মন্দিরের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। তারেহ গৃহে এসে নিজের দেবতাদের এ অবস্থা দেখে সোজা নমরূদের কাছে চলে যায়। সেখানে অভিযোগ করে, পঞ্চাশ বছর আগে আমার গৃহে যে সন্তান জন্মেছিল আজ সে আমার ঘরে এ কাজ করেছে, আপনি এর বিহিত ব্যবস্থা করুন। নমরূদ হযরত ইবরাহীমকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনি কঠোর জবাব দেন। নমরূদ তখনই তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয় তারপর শলা-পরামর্শ করে ব্যাপারটির নিষ্পত্তির জন্য নিজের পরিষদের সামনে পেশ করে। পরিষদের সদস্যরা পরামর্শ দেয় এ ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হোক। তাই একটি বিরাট আগুনের কুণ্ড তৈরি করা হয় এবং হযরত ইবরাহীমকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। হযরত ইবরাহীমের সাথে তাঁর ভাই ও শ্বশুর হারানকেও নিক্ষেপ করা হয়। কারণ নমরূদ যখন তারেহকে জিজ্ঞেস করে, তোমার এ ছেলেকে তো আমি এর জন্মের দিনেই হত্যা করতে চেয়েছিলাম, তুমি তখন একে বাঁচিয়ে এর বিনিময় অন্য শিশু হত্যা করিয়েছিলে কেন ? এর জবাবে তারেহ বলে, আমি হারানের কথায় এ কাজ করেছিলাম। তাই এ কাজ যে করেছিল তাকে ছেড়ে দিয়ে পরামর্শদাতাকে হযরত ইবরাহীমের সাথে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথেই হারান জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে যায় কিন্তু হযরত ইবরাহীমকে লোকেরা দেখে তিনি তার মধ্যে নিশ্চিন্তে আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নমরূদকে এ ব্যাপারে জানানো হয়। সে এসে স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে বলে, "ওহে আসমানের ইলাহর বান্দা ! আগুন থেকে বের হয়ে এসো এবং আমার সামনে দাড়াও।" হযরত ইবরাহীম বাইরে আসেন। নমরূদ তার ভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁকে বহু মূল্যবান নজরানা দিয়ে বিদায় করে।

এরপর তালমূদের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীম দু'বছর পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তারপর নমরূদ একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে। তার জ্যোতিষীরা এর তাবীর বর্ণনা করে বলে, ইবরাহীম আপনার সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ হবে কাজেই তাকে হত্যা করুন। সে তাঁকে হত্যা করার জন্য লোক পাঠায়। কিন্তু স্বয়ং নমরূদের প্রদত্ত একজন গোলাম আল ইয়াযার

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

৬ রুকূ'

আর এ একই নিয়ামত আমি নূহকে দান করেছিলাম। স্মরণ করো যখন এদের সবার আগে সে আমাকে ডেকেছিল,[৬৮] আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাবিপদ[৬৯] থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আর এমন সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাকে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিল। তারা খুবই খারাপ লোক ছিল, কাজেই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

আর এ নিয়ামতই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে দান করেছিলাম। স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তারা উভয়ই একটি শস্য ক্ষেতের মোকদ্দমার ফায়সালা করছিল, যেখানে রাতের বেলা ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য লোকদের ছাগল এবং আমি নিজেই দেখছিলাম তাদের বিচার। সে সময় আমি সুলাইমানকে সঠিক ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, অথচ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আমি উভয়কেই দান করেছিলাম।[৭০]

দাউদের সাথে আমি পর্বতরাজী ও পক্ষীকুলকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যারা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো,[৭১] এ কাজের কর্তা আমিই ছিলাম।

পূর্বাহ্নেই তাকে এ পরিকল্পনার খবর দেয়। ফলে হযরত ইবরাহীম পালিয়ে হযরত নূহের কাছে আশ্রয় নেন। সেখানে তারেহ এসে তাঁর সাথে গোপনে দেখা করতে থাকে। শেষে পিতাপুত্র পরামর্শ করে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত করা হয়। হযরত নূহ ও সামও এ পরিকল্পনা সমর্থন করেন। এভাবে তারেহ স্বীয় পুত্র ইবরাহীম, পৌত্র লূত এবং পৌত্রি ও পুত্রবধু সারাহকে নিয়ে উর থেকে হারান চলে আসে। (তালমূদ নির্বাচিত অংশ, এইচ, পোলানো লণ্ডন, পৃষ্ঠা ৩০-৪২)

এ বর্ণনা দেখে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কি একথা বলতে পারে যে, এটি কুরআনের উৎস হতে পারে ?

৬৭. মূলে "হুকুম ও ইলম" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন সাধারণত হুকুম ও ইলম দান নবুওয়াত দান করার সমার্থক হয়। "হুকুম" অর্থ প্রজ্ঞাও হয়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাও হয়, আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব করার বিধিসংগত অনুমতি (Authority) লাভও হয়। আর "ইলম"-এর অর্থ হচ্ছে এমন সত্য ও যথার্থ ইলম যা অহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছে। হযরত লূতের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন সূরা আ'রাফ ৮০-৮৪, সূরা হুদ ৬৯-৮৩ এবং সূরা আল হিজর ৫৭-৭৬ আয়াত।

৬৮. হযরত নূহের দোয়ার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সুদীর্ঘকাল নিজের জাতির সংশোধনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবার পর শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি যে দোয়া করেছিলেন أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ "পরওয়ারদেগার ! আমি হেরে গেছি আমাকে সাহায্য করো।" (আল কামার ঃ ১০) এবং رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا "হে আমার রব! পৃথিবী পৃষ্ঠে একজন কাফেরকেও ছেড়ে দিয়ো না।" (সূরা নূহ ঃ ২৬)

৬৯. "মহাবিপদ" অর্থ একটি অসৎ কর্মশীল জাতির মধ্যে জীবন যাপন করার বিপদ অথবা মহাপ্লাবন। হযরত নূহের কাহিনী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ৫৯ থেকে ৬৪, সূরা ইউনুস ৭১ থেকে ৭৩, সূরা হূদ ২৫-৪৮ এবং বনী ইসরাঈল ৩ আয়াতসমূহ।

৭০. বাইবেলে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়নি। ইহুদী সাহিত্যেও আমরা এর কোনো চিহ্ন দেখি না। মুসলমান তাফসীরকারগণ এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির শস্যক্ষেতে অন্য এক ব্যক্তির ছাগলগুলো রাতের বেলা ঢুকে পড়ে। সে হযরত দাউদের কাছে অভিযোগ করে। তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির ছাগলগুলো ছিনিয়ে নিয়ে প্রথম ব্যক্তিকে দিয়ে দেবার ফায়সালা শুনিয়ে দেন। হযরত সুলায়মান এ ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তিনি রায় দেন, ছাগলগুলো ততদিন পর্যন্ত ক্ষেতের মালিকের কাছে থাকবে যতদিন না সে আবার নিজের ক্ষেত শস্যে পূর্ণ করে নিতে পারে। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলছেন, সুলায়মানকে এ ফায়সালাটি আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু মোকদ্দমার এ বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে বর্ণিত হয়নি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদীসেও এ বিবরণ আসেনি তাই একথা বলা যেতে পারে না যে, এ ধরনের মামলায় এটিই ইসলামী শরীয়াতের প্রামাণ্য আইন। এ কারণেই হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও অন্যান্য ইসলামী ফকীহগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে যে, যদি কারো ক্ষেত অন্যের পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা এবং দিতে হলে কোন্ অবস্থায় হবে এবং কোন্ অবস্থায় হবে না, তাছাড়া কিভাবে এ ক্ষতিপূরণ করা হবে। ?

এ প্রেক্ষাপটে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) এ বিশেষ ঘটনাটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, নবীগণ নবী হবার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অসাধারণ শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষই হতেন। আল্লাহর সার্বভৌম

কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে থাকতো না। এ মোকদ্দমার ব্যাপারে অহীর মাধ্যমে হযরত দাউদকে সাহায্য করা হয়নি। ফলে তিনি ফায়সালা করার ব্যাপারে ভুলের শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে হযরত সুলায়মানকে অহীর মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে, ফলে তিনি সঠিক ফায়সালা দিয়েছেন। অথচ দু'জনই নবী ছিলেন। সামনের দিকে এ উভয় নবীর যেসব দক্ষতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাও একথা বুঝাবার জন্যে যে, এসব আল্লাহ প্রদত্ত দক্ষতা এবং এ ধরনের দক্ষতার কারণে কেউ আল্লাহর সমকক্ষ হয়ে যায় না।

এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে ন্যায়বিচারের এ মূলনীতিও জানা যায় যে, দু'জন বিচারপতি যদি একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করে এবং দুজনের ফায়সালা বিভিন্ন হয়, তাহলে যদিও একজনের ফায়সালাই সঠিক হবে তবুও দু'জনেই ন্যায়বিচারক বিবেচিত হবেন। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে বিচার করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে। তাদের কেউ যেন অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা সহকারে বিচারকের আসনে বসে না যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে একথা আরো বেশী সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। বুখারীতে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر

"যদি বিচারক নিজের সামর্থ অনুযায়ী ফায়সালা করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান, তাহলে সঠিক ফায়সালা করার ক্ষেত্রে তিনি দু'টি প্রতিদান পাবেন এবং ভুল ফায়সালা করলে পাবেন একটি প্রতিদান।

আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় বুরাইদার (রা) রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নবী (স) বলেছেন ঃ "বিচারক তিন প্রকারের। এদের একজন জান্নাতী এবং দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতের অধিকারী হচ্ছেন এমন বিচারক, যিনি সত্য চিহ্নিত করতে পারলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য চিহ্নিত করার পরও সত্য বিরোধী ফায়সালা দেয় সে জাহান্নামী। আর অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই লোকদের মোকদ্দমার ফায়সালা করতে বসে যায় সেও জাহান্নামী।"

৭১. মূলে مَعَ دَاوُدَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, لِدَاوُدَ বলা হয়নি। অর্থাৎ "দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য" নয় বরং "তাঁর সাথে" পাহাড় ও পাখীদেরকে অনুগত করা হয়েছিল এবং সে কারণে তারাও হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতো। একথাটিই সূরা সাদ-এ বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝

"আমি তার সাথে পাহাড়গুলোকে অনুগত করে দিয়েছিলাম। সকাল-সাঁঝে তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। আর পাখিদেরকেও অনুগত করা হয়েছিল। তারা একত্র হতো, সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মাহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করতো।"

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ۞ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ۞ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۞

আর আমি তাকে তোমাদের উপকারার্থে বর্ম নির্মাণ শিল্প শিখিয়েছিলাম, যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত থেকে রক্ষা করে,[৭২] তাহলে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে ?[৭৩] আর সুলাইমানের জন্য আমি প্রবল বায়ু প্রবাহকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে এমন দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যার মধ্যে আমি বরকত রেখেছিলাম[৭৪] আমি সব জিনিসের জ্ঞান রাখি। আর শয়তানের মধ্য থেকে এমন অনেককে আমি তার অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করতো এবং এছাড়া অন্য কাজও করতো, আমিই ছিলাম এদের সবার তত্ত্বাবধায়ক।[৭৫]

সূরা সাবায় এর ওপর অতিরিক্ত বলা হয়েছে يَا جِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ "পাহাড়গুলোকে আমি হুকুম দিয়েছিলাম যে, তাঁর সাথে সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করো এবং এই একই হুকুম পাখিদেরকেও দিয়েছিলাম।" এ বক্তব্যগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, হযরত দাউদ যখন আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা গীতি গাইতেন তখন তাঁর উচ্চতর ও সুরেলা আওয়াজে পাহাড় গুঞ্জরিত হতো, পাখিরা থেমে যেতো এবং একটা অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টি হতো। এ অর্থের সমর্থন একটি হাদীস থেকে পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল অসাধারণ সুরেলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আওয়াজ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনেকক্ষণ শুনতে থাকলেন। তার পড়া শেষ হলে তিনি বললেন لقد اوتى مزمارا من مزامير ال داود অর্থাৎ এ ব্যক্তি দাউদের সুরেলা কণ্ঠের একটা অংশ পেয়েছে।

সূরা সাবায় এর ওপর আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ

"আর আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি (এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছি) যে, পূর্ণমাপের বর্ম তৈরি করো এবং বুনন করার ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাণ রক্ষা করো।"

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ হযরত দাউদকে লোহা ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। বিশেষ করে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বর্ম নির্মাণের কায়দা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ আয়াতের অর্থের ওপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে লৌহ যুগ (Iron age) শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব ১২০০ ও ১০০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে। আর এটিই ছিল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের যুগ। প্রথম দিকে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের হিত্তী (Hittites) জাতি লোহা ব্যবহার করে। ২০০০ থেকে ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এ জাতির উত্থান দেখা যায়। তারা লোহা গলাবার ও নির্মাণের একটা জটিল পদ্ধতি জানতো। সারা দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে তারা একে কঠোরভাবে গোপন রাখে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে যে লোহা তৈরি হতো তা সোনা রূপার মতো এত বেশী মূল্যবান হতো যে, তা সাধারণ কাজে ব্যবহার করা যেত না। পরে ফিলিস্তিনীরা এ পদ্ধতি জেনে নেয় এবং তারাও একে গোপন রাখে। তালুতের রাজত্বের পূর্বে হিত্তী ও ফিলিস্তিনীরা বনী ইসরাঈলকে যেভাবে উপর্যুপরী পরাজিত করে ফিলিস্তীন থেকে প্রায় বেদখল করে দিয়েছিল বাইবেলের বর্ণনা মতে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, তারা লোহার রথ ব্যবহার করতো এবং তাদের কাছে লোহার তৈরি অন্যান্য অস্ত্রও থাকতো। (যিহোশূয় ১৭ ঃ ১৬, বিচারকর্তৃগণ ১ ঃ ১৯, ৪ ঃ ২-৩) খৃষ্ট পূর্ব ১০২০ অব্দে তালূত যখন আল্লাহর হুকুমে বনী ইসরাঈলদের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি তাদেরকে পরপর কয়েকবার পরাজিত করে ফিলিস্তীনের বেশীর ভাগ অংশ তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন। তারপর হযরত দাউদ (১০০৪-৯৬৫ খৃঃ পূঃ) শুধুমাত্র ফিলিস্তীন ও ট্রান্স জর্দানই নয় বরং সিরিয়ারও বড় অংশে ইসরাঈলী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় লৌহ নির্মাণ শিল্পের যে গোপন কলাকৌশল হিত্তী ও ফিলিস্তীনদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তা উন্মোচিত হয়ে যায় এবং কেবলমাত্র উন্মোচিত হয়েই থেমে যায়নি বরং লৌহ নির্মাণের এমন পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয় যার ফলে সাধারণ ব্যবহারের জন্য লোহার কম দামের জিনিসপত্রও তৈরি হতে থাকে। ফিলিস্তিনের দক্ষিণে আদূম এলাকা আকরিক লোহায় (Iron ore) সমৃদ্ধ ছিল। সম্প্রতি এ এলাকায় যে প্রত্নতাত্বিক খননকার্য চালানো হয় তার ফলে এমন অনেক জায়গার প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনসমূহ পাওয়া গেছে যেখানে লোহা গলাবার চুল্লী বসানো ছিল। আকাবা ও আইলার সাথে সংযুক্ত হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের জামানার বন্দর ইসয়ুন জাবেরের প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে যে চুল্লী পাওয়া গেছে তা পর্যবেক্ষণের পরে অনুমান করা হয়েছে যে, তার মধ্যে এমনসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো যা আজকের অত্যাধুনিক যুগের Blast Furnace এ প্রয়োগ করা হয়। এখন স্বাভাবিকভাবেই হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সবার আগে ও সবচেয়ে বেশী করে এ নতুন আবিষ্কারকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকবেন। কারণ কিছুকাল আগেই আশপাশের শত্রু জাতিরা এ লোহার অস্ত্র ব্যবহার করে তাঁর জাতির জীবন ধারণ কঠিন করে দিয়েছিল।

৭৩. হযরত দাউদ সম্পর্কে আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারাহ ২৫১ আয়াত ও বনী ইসরাঈল ৭, ৬৩ টীকা।

৭৪. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সূরা সাবায় এভাবে ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ

"আর সুলায়মানের জন্য আমি বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত।"

এর আরো বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে সূরা সাদ-এ। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ .

"কাজেই আমি তার জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে সহজে চলাচল করতো যেদিকে সে যেতে চাইতো।"

এ থেকে জানা যায়, বাতাসকে হযরত সুলায়মানের হুকুমে এভাবে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর রাজ্যের এক মাস দূরত্বের পথ পর্যন্ত যে কোনো স্থানে তিনি সহজে সফর করতে পারতেন। যাওয়ার সময়ও সবসময় তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অনুকূল বাতাস পেতেন আবার ফেরার সময়ও। বাইবেল ও আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ বিষয়বস্তুর ওপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, হযরত সুলায়মান তাঁর রাজত্বকালে নৌবাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটান। একদিকে ইসয়ূন জাবের বন্দর থেকে তাঁর বাণিজ্য বহর লোহিত সাগরে ইয়ামেন এবং অন্যান্য পূর্ব ও দক্ষিণ দেশসমূহে যাতায়াত করতো এবং অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরের বন্দরসমূহ থেকে তাঁর নৌবহর (যাকে বাইবেলে তর্শীশী নৌবহর বলা হয়েছে) পশ্চিম দেশসমূহে যেতো। ইসয়ুন জাবের তাঁর সময়ের যে বিশাল চুল্লী পাওয়া গেছে তার সাথে তুলনীয় কোনো চুল্লী আজ পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায়নি। প্রত্নতত্ব বিশেষজ্ঞগণের মতে এখানে আদুমের আরাবাহ এলাকার খনি থেকে আশোধিত লোহা ও তামা আনা হতো এবং এই চুল্লীতে গলাবার পর সেগুলো অন্যান্য কাজ ছাড়া জাহাজ নির্মাণ কাজেও ব্যবহার করা হতো। এ থেকে কুরআন মজীদে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সূরা সাবায় যে কথা বলা হয়েছে وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ (আর আমি তার জন্য গলিত ধাতুর ঝরণা প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম) তার ওপর আলোকপাত হয়। তাছাড়া এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সামনে রাখলে হযরত সুলায়মানের জন্য এক মাসের পথ পর্যন্ত বায়ু প্রবাহকে "বশীভূত" করার অর্থ অনুধাবন করা যায়। সেকালে সামুদ্রিক সফর পুরোপুরি অনুকূল বাতাসের ওপর নির্ভর করতো। মহান আল্লাহ হযরত সুলায়মানের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন, যার ফলে তাঁর দুটি সামুদ্রিক বহর সবসময় তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এই অনুকূল বাতাস পেতো। তবুও যদি বাতাসের ওপর হযরত সুলায়মানকে হুকুম চালাবার কোনো কর্তৃত্ব ক্ষমতা দেয়া হয়ে থাকে যেমন تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ (তার হুকুমে চলতো) এর শব্দাবলীর বাহ্যিক অর্থ থেকে মনে হয়, তাহলে আল্লাহর কুদরাতের জন্য এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তিনি নিজের রাজ্যের মালিক। নিজের যে কোনো বান্দাকে যে কোনো ক্ষমতা তিনি চাইলে দিতে পারেন। তিনি কাউকে কোনো ইখতিয়ার ও ক্ষমতা দান করলে আমাদের মনকষ্টের কোনো কারণ নেই।

৭৫. সূরা সাবা-য় এর বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ○ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۚ .... فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ○ - سبا : ١٢-١٤

"আর জিনদের মধ্য থেকে এমন জিনকে আমি তার জন্য অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তার রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো। আর তাদের মধ্য থেকে যে কেউ আমার হুকুম অমান্য করতো আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ আস্বাদন করাতাম। তারা তার জন্য যেমন সে চাইতো প্রাসাদ, মূর্তি, হাউজের মতো বড় আকারের পাত্র এবং দৃঢ় ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করতো।............তারপর যখন আমি সুলায়মানকে মৃত্যু দান করলাম, এই জিনদেরকে তার মৃত্যুর কথা জানালো কেবল মাটির পোকা (অর্থাৎ ঘূণ) যারা তার লাঠি খাচ্ছিল। তাই যখন সে পড়ে গেলো তখন জিনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা যদি সত্যিই অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকতো তাহলে এ লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে এত দীর্ঘ সময় সময় আবদ্ধ থাকতো না।" এ আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত সুলায়মানকে যেসব জিনের ওপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল এবং যারা তাঁর বিভিন্ন কাজ করে দিতো তারা এমন পর্যায়ের জিন ছিল যাদের সম্পর্কে আরব মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল এবং তারা নিজেরাও এ ভুল ধারণা পোষণ করতো যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে। এখন যে ব্যক্তি সতর্ক দৃষ্টিতে কুরআন মজীদ পড়বে এবং নিজের পূর্বাহ্নের বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণার অনুসারী না হয়ে পড়বে, সে নিজেই দেখে নিতে পারে যেখানে কুরআন নির্বিশেষে "শয়তান" ও "জিন" শব্দ ব্যবহার করে সেখানে তার অর্থ হয় কোন্ ধরনের সৃষ্টি এবং আরবের মুশরিকরা যাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করতো কুরআনের দৃষ্টিতে তারা কোন ধরনের জিন।

আধুনিক যুগের মুফাসসিরগণ একথা প্রমাণ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছেন যে, হযরত সুলায়মানের জন্য যেসব জিন ও শয়তানকে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল তারা মানুষ ছিল এবং আশেপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে তাদেরকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের শব্দাবলীর মধ্যে তাদের এ ধরনের জটিল অর্থ করার শুধু যে, কোনো অবকাশই নেই তাই নয় বরং কুরআনের যেখানেই এ ঘটনাটি এসেছে সেখানে আগে পিছের আলোচনা ও বর্ণনাভংগীই এ অর্থের পথে পরিষ্কার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। হযরত সুলায়মানের জন্য ইমারত নির্মাণকারীরা যদি মানুষই হয়ে থাকবে তাহলে তাদের এমন কি বিশেষত্ব ছিল যে, তাদের কথা কুরআন মজীদে এমন বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ?

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾

আর (এ একই বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান) আমি আইয়ুবকে দিয়েছিলাম।[৭৬] স্মরণ করো, যখন সে তার রবকে ডাকলো, "আমি রোগগ্রস্ত হয়ে গেছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী।"[৭৭] আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম[৭৮] এবং শুধুমাত্র তার পরিবার পরিজনই তাকে দেইনি বরং এই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য।[৭৯]

মিসরের পিরামিড থেকে শুরু করে নিউইয়র্কের গগণচুম্বী ইমারতগুলো পর্যন্ত কোনটি মানুষ তৈরি করেনি ? অথচ কোনো বাদশাহ, ধনকুবের ও বিশ্বখ্যাত ব্যবসায়ীর জন্য এমন ধরনের "জিন" ও "শয়তান" সরবরাহ করা হয়নি যা হযরত সুলামানের জন্য করা হয়েছিল।

৭৬. হযরত আইয়ুবের (আ) ব্যক্তিত্ব, সময়, জাতীয়তা সব বিষয়েই মতবিরোধ আছে। আধুনিক যুগের মুফাসসিরগণের মধ্য থেকে কেউ তাঁকে ইসরাঈলী গণ্য করেন। কেউ বলেন, তিনি মিসরীয়। আবার কেউ বলেন, আরব ছিলেন। কারো মতে, তিনি ছিলেন হযরত মূসার পূর্ববর্তীকালের লোক। কেউ বলেন, তিনি হযরত দাউদ (আ) ও সুলায়মানের (আ) আমলের লোক। আবার কেউ তাঁকে তাঁদেরও পরবর্তীকালের পুরাতন নিয়মে সংযোজিত ইয়োব তথা আইয়ুবের সিফর বা আইয়ুবের সহীফা। তার ভাষা, বর্ণনা ভংগী ও বক্তব্য দেখে এসব বিভিন্ন মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এ ইয়োব বা আইয়ুবের সহীফার অবস্থা হচ্ছে এই যে, এর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে বৈপরিত্য এবং এর বর্ণনা কুরআন মজীদের বর্ণনা থেকে এত বেশী ভিন্নতর যে, উভয়কে একসাথে মেনে নেয়া যেতে পারে না। কাজেই আমরা এর ওপর একটুও নির্ভর করতে পারি না। বড় জোর নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য যদি কিছু হয় তাহলে তা হচ্ছে এই যে, ইয়াসইয়াহ (যিসাই) নবী ও হিযকিইল (যিহিস্কেল) নবীর সহীফায় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সহীফা দু'টি ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। ইয়াসইয়াহ নবী খৃষ্টপূর্ব অষ্টম এবং হিযকীইল নবী খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাই নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম খৃষ্টপূর্ব নবম শতক বা এরও পূর্বের নবী ছিলেন। তাঁর জাতীয়তা সম্পর্কে বলা যেতে পারে, সূরা নিসার ১৬৩ ও সূরা আনআমের ৮৪ আয়াতে যেভাবে তাঁর আলোচনা এসেছে তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি বনী ইসরাঈলের অন্তরভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ওহাব

ইবনে মুনাববিহের এ বর্ণনাও একেবারে অযৌক্তিক নয় যে, তিনি হযরত ইসহাকের (আ) পুত্র ঈসূর বংশধর ছিলেন।

৭৭. দোয়ার ধরন অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়। সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন—"তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" পরে কোনো অভিযোগ ও নালিশ নেই, কোনো জিনিসের দাবী নেই। দোয়ার এই ভংগিমা যে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন চিত্রটি তুলে ধরে তা হচ্ছে এই যে, কোনো পরম ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট, ভদ্র ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি দিনের পর দিন অনাহার ক্লিষ্টতার দুঃসহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে কোনো পরমদাতা ও দয়ালু ব্যক্তির সামনে কেবলমাত্র এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায়। "আমি অনাহারে আছি এবং আপনি বড়ই দানশীল।" এরপর সে আর মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না।

৭৮. সূরা সাদের চতুর্থ রুকূতে এর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁকে বলেন ঃ

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ.

"নিজের পা দিয়ে আঘাত করো, এ ঠাণ্ডা পানি মজুদ আছে গোসল ও পান করার জন্য।"

এ থেকে জানা যায়, মাটিতে পা ঠুকবার সাথে সাথেই আল্লাহ তাঁর জন্য একটি প্রাকৃতিক ঝরণাধারা প্রবাহিত করেন। এ ঝরণার পানির বৈশিষ্ট ছিল এই যে, এ পানি পান ও এতে গোসল করার সাথে সাথেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। এ রোগ নিরাময়ে এদিকে ইংগিত করে যে, তাঁর কোনো মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছিল। বাইবেলের বর্ণনাও এর সমর্থক। বাইবেল বলছে, তাঁর সমস্ত শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফোঁড়ায় ভরে গিয়েছিল।

(ইয়োব ২ ঃ ৭)

৭৯. এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে কুরআন মজীদ হযরত আইয়ুবকে এমনভাবে পেশ করেছে যার ফলে তাঁকে সবরের প্রতিমূর্তি মনে হয়। এরপর কুরআন বলছে, তাঁর জীবন ইবাদাতকারীদের জন্য একটি আদর্শ। অন্যদিকে বাইবেলের আইয়ুবের সহীফা (ইয়োব) পড়লে সেখানে এমন এক ব্যক্তির ছবি ফুটে উঠবে যিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগে সোচ্চার এবং নিজের বিপদের জন্য আপাদমস্তক ফরীয়াদী হয়ে আছেন। বারবার তাঁর মুখ থেকে এ বাক্যটি নিঃসৃত হচ্ছে ঃ "বিলুপ্ত হোক সেদিন যেদিন আমার জন্ম হয়েছিল।" "আমি কেন গর্ভে মরে যাইনি ?" "মায়ের পেট থেকে বের হওয়া মাত্র আমি কেন প্রাণত্যাগ করিনি ?" বারবার তিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন "সর্বশক্তিমানের বান আমার ভিতরে প্রবিষ্ট, আমার আত্মা তাঁরই বিষপান করছে, ঈশ্বরীয় ত্রাসদল আমার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ।" "হে মনুষ্য দর্শক, আমি যদি পাপ করে থাকি, তবে আমার কর্মে তোমার কি হয় ? তুমি কেন আমাকে তোমার শর লক্ষ করেছো ? আমিতো আপনার ভার আপনি হয়েছি। তুমি আমার অধর্ম ক্ষমা কর না কেন ? আমার অপরাধ দূর কর না কেন ?" "আমি ঈশ্বরকে বলবো আমাকে দোষী করো না ; আমাকে বল আমার সাথে কি কারণে বিবাদ করছো। এটা কি ভাল যে, তুমি উপদ্রব করবে ? তোমার হস্তনির্মিত বস্তু তুমি তুচ্ছ

করবে ? দুষ্টগণের মন্ত্রণায় প্রসন্ন হবে ?" তাঁর তিন বন্ধু এসে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং ধৈর্য, আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টিলাভ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা শুনেন না। তিনি তাদের পরামর্শের জবাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনতে থাকেন। এবং তাদের শত বুঝাবার পরও জোর দিয়ে বলতে থাকেন যে, আল্লাহর এ কাজের মধ্যে কোনো প্রজ্ঞা ও কল্যাণ নেই, আছে শুধু একটা জুলুম, যা আমার মতো মুত্তাকী ও ইবাদাতকারী ব্যক্তির প্রতি করা হচ্ছে। তিনি আল্লাহর ব্যবস্থাপনার কঠোর সমালোচনা করেন এই বলে যে, একদিকে দুষ্কৃতকারীদেরকে অনুগৃহীত করা হয় এবং অন্যদিকে সুকৃতিকারীদেরকে জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ করা হয়। নিজের সৎকর্মগুলোকে তিনি এক এক করে গণনা করেন তারপর এর প্রতিদানে আল্লাহ তাঁকে যেসব কষ্ট দিয়েছেন সেগুলো বর্ণনা করতে থাকেন এবং এরপর বলেন, আল্লাহর কাছে যদি কোনো জবাব থাকে তাহলে তিনি বলুন কোন্ অপরাধের শাস্তি হিসেবে আমার সাথে এ ব্যবহার করা হয়েছে? নিজের স্রষ্টা ও প্রভুর বিরুদ্ধে তাঁর এ অভিযোগ ধীরে ধীরে এত বেশী বেড়ে যেতে থাকে যে, শেষে তাঁর বন্ধুরা তাঁর কথার জবাব দেয়া বন্ধ করে দেন। তারা চুপ করে যান। তখন চতুর্থ এক ব্যক্তি, যিনি তাঁদের কথা নিরবে শুনছিলেন, মাঝখান থেকে হস্তক্ষেপ করেন এবং আইয়ুবকে এ ব্যাপারে ভীষণভাবে তিরস্কার করতে থাকেন যে, "তিনি তো আল্লাহকে নয় বরং নিজেকে সঠিক গণ্য করছেন।" এ ভাষণ শেষ হবার আগেই মাঝখান থেকে আল্লাহ নিজেই বলে ওঠেন এবং তারপর তাঁর ও আইয়ুবের মধ্যে খুব মুখোমুখী বিতর্ক হতে থাকে। এ পুরো কাহিনীটি পড়তে পড়তে আমরা একবারও অনুভব করি না যে, আমরা এমন এক অতুলনীয় ধৈর্যশীল নবীর অবস্থা ও কথা পড়ছি যার চিত্র কুরআন ইবাদাতকারীদের জন্য শিক্ষণীয় ও আদর্শ হিসেবে পেশ করছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, এ পুস্তকের প্রথম অংশ এক ধরনের কথা বলে, মাঝখানের অংশ বলে ভিন্ন কথা এবং শেষে ফলাফল দেখা যায় সম্পূর্ণ অন্য কিছু। এ তিন অংশের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য নেই। প্রথম অংশ বলে, আইয়ুব একজন বড়ই সত্যনিষ্ঠ, খোদাভীরু ও কুকর্ম ত্যাগকারী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এই সংগে তিনি এতই ধনাঢ্য ছিলেন যে, "পূর্ব দেশের লোকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড়লোক।" একদিন আল্লাহর কাছে তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর নিজের) পুত্রগণ হাজির হন। তাদের সাথে শয়তানও আসে। আল্লাহ সেই মজলিসে তার বান্দা আইয়ুবের জন্য গর্ব করেন। শয়তান বলে, আপনি তাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তারপর সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আর কি করবে ? তার প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন সেগুলো একবার ছিনিয়ে নেন তারপর দেখুন সে যদি আপনার মুখের ওপর আপনাকে অস্বীকার না করে থাকে তাহলে আমার নাম শয়তান নয়। আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তার সব কিছু তোমার হস্তগত করে দেয়া হচ্ছে, শুধুমাত্র তার শারীরীক কোনো ক্ষতি করো না। শয়তান গিয়ে আইয়ুবের সমস্ত ধন-দওলত ও পরিবার পরিজন ধ্বংস করে দেয়। আইয়ুব সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধুমাত্র একাই থেকে যান। কিন্তু এতে আইয়ুবের মনে কোনো দুঃখ ও ক্ষোভ জাগেনি। তিনি আল্লাহকে সিজদা করেন এবং বলেন, "আমি মায়ের গর্ভ থেকে উলংগ এসেছি এবং উলংগই ফিরে যাবো ; খোদাই দিয়েছেন আবার খোদাই নিয়েছেন, খোদার নাম ধন্য হোক।" আবার এক দিন আল্লাহর দরবারে একই ধরনের একটি মজলিস বসে। তাঁর ছেলেরা আসে, শয়তানও আসে। আল্লাহ

শয়তানকে বলেন, আইয়ুব কেমন সত্যনিষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছে দেখে নাও। শয়তান বলে, আচ্ছা, জনাব, তার শরীরকে একবার বিপদগ্রস্থ করে দেখুন সে আপনার মুখের ওপর আপনার কুফরী করবে। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে যাও, তাকে তোমার হাতে দেয়া হচ্ছে, তবে তার প্রাণটি যেন সংরক্ষিত থাকে। অতপর শয়তান ফিরে যায়। সে "আইয়ুবকে মাথার চাঁদি থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক ফোড়ায় ভরে দেয়।" তার স্ত্রী তাকে বলে, "এখনো কি তুমি তোমার সত্যনিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ? আল্লাহকে অমান্য করো এবং প্রাণত্যাগ করো।" তিনি জবাব দেন, "তুমি মূঢ়া স্ত্রীর মতো কথা বলছো। আমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে শুধু সুখ পাবো, দুঃখ পাবো না।"

এ হচ্ছে আইয়ুবের সহীফার (ইয়োব পুস্তক) প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার। কিন্তু এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে একটি ভিন্নতর বিষয়বস্তু শুরু হয়েছে। এটি বিয়াল্লিশতম অধ্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এসব অধ্যায়ে হযরত আইয়ুবের ধৈর্যহীনতা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও দোষারোপের একটি ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তা থেকে একথা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, হযরত আইয়ুবের সম্পর্কে আল্লাহর অনুমান ভুল ও শয়তানের অনুমান সঠিক ছিল। তারপর বিয়াল্লিশতম অধ্যায়ের শেষের দিকে আল্লাহর সাথে একচোট তর্ক বিতর্ক করার পর ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে নয় বরং আল্লাহর তিরস্কার ও ধমক খেয়ে আইয়ুব তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং তিনি তা গ্রহণ করে তার সমস্ত কষ্ট দূর করে দেন। এরপর তাকে পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী সম্পদ দান করেন। এ শেষ অংশটি পড়তে গিয়ে মনে হবে আইয়ুব ও আল্লাহ উভয়েই শয়তানের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছেন। তারপর নেহাত নিজের কথা রাখার জন্যই আল্লাহ ধমক দিয়ে তাকে মাফ চাইতে বাধ্য করেন এবং মাফ চাওয়ার সাথে সাথেই তা গ্রহণ করে নেন, যাতে শয়তানের সামনে তাঁকে লজ্জিত হতে না হয়।

এ পুস্তকটি নিজ মুখেই একথা ঘোষণা করছে যে, এটি আল্লাহর বা হযরত আইয়ুবের বাণী নয়। বরং হযরত আইয়ুবের জামানার বইও নয় এটি। তাঁর ইন্তেকালের শত শত বছর পরে কোনো এক ব্যক্তি আইয়ুবের ঘটনাকে ভিত্তি করে "ইউসুফ যোলায়খা" ধরনের একটি চমকপ্রদ কাহিনী কাব্য রচনা করেন। তাতে আইয়ুব (ইয়োব) তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিলদদ, নামাথীয় সোফর, বুষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূ প্রমুখ কয়েকটি চরিত্র উপস্থাপন করে তাদের মুখ দিয়ে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আসলে তিনি নিজের মনগড়া দর্শন বর্ণনা করেছেন। তার কাব্য প্রতিভা ও চমৎকার বর্ণনা ভংগীর যতই প্রশংসা করতে পারেন করুন কিন্তু তাকে পবিত্র কিতাব ও আসমানী সহীফার অন্তরভুক্ত করার কোনো অর্থ নেই। আইয়ুব আলাইহিস সালামের জীবনী ও সীরাতের সাথে তার সম্পর্ক ঠিক ততটুকু যতটুকু সম্পর্ক আছে "ইউসুফ যোলায়খা"র সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালামের। বরং সম্ভবত অতটুকুও নেই। বড়জোর আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, এ পুস্তকের প্রথম ও শেষ অংশে যেসব ঘটনা বলা হয়েছে তার মধ্যে সঠিক ইতিহাসের একটি উপাদান পাওয়া যায়। কবি তা শ্রুতি থেকে গ্রহণ করে থাকবেন, যা তাঁর যুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল অথবা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এমন কোনো সহীফাহ থেকে নিয়ে থাকবেন।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۖ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۗ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

আর এ নিয়ামতই ইসমাঈল, ইদরীস[৮০] ও যুলকিফ্‌লকে[৮১] দিয়েছিলাম, এরা সবাই সবরকারী ছিল এবং এদেরকে আমি নিজের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম, তারা ছিল সৎকর্মশীল।

আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহভাজন করেছিলাম।[৮২] স্মরণ করো যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল[৮৩] এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না।[৮৪] শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলো ঃ[৮৫] "তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।" তখন আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

৮০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা রূমের ৩৩ টীকা।

৮১. "যুলকিফ্‌ল"-এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে "ভাগ্যবান" এবং অর্থ হচ্ছে নৈতিক মাহাত্ম ও পরকালীন সওয়াবের দৃষ্টিতে ভাগ্যবান, পার্থিব স্বার্থ ও লাভের দৃষ্টিতে নয়। এটি সংশ্লিষ্ট মনীষীর নাম নয় বরং তাঁর উপাধি। কুরআন মজীদে দু'জায়গায় তাঁর কথা বলা হয়েছে। দু'জায়গায়ই তাঁকে এ উপাধির মাধ্যমে স্মরণ করা হয়েছে, নামের সাহায্যে নয়।

কে এই যুলকিফ্‌ল ? কি তাঁর পরিচয় ? কোন্ দেশ ও জাতির সাথে তাঁর সম্পর্কে ছিল ? তিনি কোন্ যুগের লোক ছিলেন ? এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের উক্তিগুলো বড় বেশী বিক্ষিপ্ত। কেউ বলেন, এটি হযরত যাকারিয়ার (আ) দ্বিতীয় নাম (অথচ এটি একটি সুস্পষ্ট ভুল কথা। কারণ, তাঁর আলোচনা এর পরই সামনের দিকে আসছে)। কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ইলিয়াস (আ)। কেউ ইউশা' ইবনে নূনের নাম নেন। কেউ বলেন, তিনি আল ইয়াসা (অথচ এটিও ভুল। কারণ, সূরা সা'দ-এ তাঁর কথাও "যুলকিফ্‌ল"-এর কথা আলাদা আলাদা করে বলা হয়েছে।) কেউ তাঁকে হযরত আল ইয়াসার (আ) খলীফা বলেন। আবার কারোর বক্তব্য হচ্ছে, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ুবের ছেলে। হযরত আইয়ুবের (আ)

পরে তিনি নবী হন এবং তাঁর আসল নাম ছিল বিশর। আল্লামা আলূসী তাঁর রূহুল মা'আনী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইহুদীদের দাবী হচ্ছে, তিনি হিযকিইল (যিহিস্কেল) নবী। বনী ইসরাঈলদের পরাধীনতার (৫৯৭ খৃঃ পূঃ) যুগে তিনি নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত হন এবং খাবুর (কবার) নদীর তীরে একটি জনপদে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।"

এ বিভিন্ন উক্তি ও মতামতের ভিত্তিতে তিনি যথার্থই কোন্ নবী ছিলেন নিশ্চিত নির্ভরতার সাথে বলা যেতে পারে না। বর্তমান যুগের মুফাসসিরগণ হিযকিইল নবীর দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু এ মত গ্রহণের পক্ষে আমি কোনো ন্যায় সংগত যুক্তি-প্রমাণ পেলাম না। তবুও এর সপক্ষে কোনো যথাযথ প্রমাণ পেলে এ মতটিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। কারণ, বাইবেলের হিযকিইল সহীফাটি দেখলে মনে হয় যথার্থই এ আয়াতে তাঁর যে প্রশংসা করা হয়েছে তিনি তার হকদার অর্থাৎ ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ। জেরুসালেম শেষবার ধ্বংস হবার আগে বখতে নসরের হাতে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তিনি ছিলেন তাদের একজন। বখতে নসর ইরাকে ইসরাঈলী কয়েদীদের একটি উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল খাবুর (কবার) নদীর তীরে এর নাম ছিল তেলআবীব। এ স্থানেই ৫৯৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে হযরত হিযকিইল নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। অবিশ্রান্তভাবে ২২ বছর ধরে তিনি একদিকে বিপদগ্রস্ত ইসরাঈলীদেরকে এবং অন্যদিকে জেরুসালেমের গাফেল ও অস্থির-বিহ্বল অধিবাসী ও শাসকদেরকে সজাগ করার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এ মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও আত্মনিমগ্নতা অবশ্য প্রণিধানযোগ্য। একটি ঘটনা থেকে এ বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে। নবুওয়াতের নবম বছরে তাঁর স্ত্রী, যাকে তিনি নিজেই বলেন, "নয়নের প্রীতি পাত্র" ইন্তিকাল করেন। লোকেরা শোক প্রকাশের জন্য তাঁর বাড়িতে জমায়েত হয়। এদিকে তিনি নিজের মানসিক যন্ত্রণা ও শোকের কথা বাদ দিয়ে নিজের সম্প্রদায়কে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে থাকেন। এ আযাব সে সময় তাদের মাথার ওপর ঝুলছিল। (২৪ ঃ ১৫-২৭) বাইবেলের যিহিস্কেল পুস্তক এমন একটি পুস্তক যা পড়ে মনে হয় সত্যি এটি আল্লাহর কালাম।

৮২. অর্থাৎ হযরত ইউনুছ (আ)। কোথাও সরাসরি তাঁর নাম নেয়া হয়েছে আবার কোথাও "যুন্নুন" ও "সাহেবুল হূত" বা মাছওয়ালা উপাধির মাধ্যমে তাঁকে স্বরণ করা হয়েছে। তিনি মাছ ধরতেন বা বেচতেন বলে তাঁকে মাছওয়ালা বলা হতো না বরং আল্লাহর হুকুমে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল, তাই তাঁকে বলা হয়েছে মাছওয়ালা। সূরা সাফ্ফাতের ১৪২ আয়াতে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস ৯৮-১০০ এবং আস সাফ্ফাত ৭৭-৮৫ টীকা।

৮৩. অর্থাৎ তিনি নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান। আল্লাহর পক্ষ থেকে তখনো হিজরত করার হুকুম আসেনি, যার ফলে তাঁর পক্ষে নিজের কর্তব্য ত্যাগ করা জায়েয হতে পারতো।

৮৪. তিনি মনে করেছিলেন, আমার সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর আযাব এসে যাচ্ছে। এখন আমাকে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়া উচিত। না হলে আমি নিজেও আযাবের মধ্যে ঘেরাও হয়ে যাবো। নীতিগতভাবে এ বিষয়টি তো পাকড়াওযোগ্য ছিল না। কিন্তু নবীর পক্ষে আল্লাহর হুকুম ছাড়া দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাওয়া ছিল পাকড়াওযোগ্য।

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۡ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۚ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝

আর যাকারিয়ার কথা (স্মরণ করো), যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না এবং সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই।" কাজেই আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ইয়াহ্ইয়া দান করেছিলাম, আর তার স্ত্রীকে তার জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম।[৮৬] *তারা সৎকাজে আপ্রাণ চেষ্টা করতো, আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতি সহকারে এবং আমার সামনে ছিল অবনত হয়ে।*[৮৭]

৮৫. অর্থাৎ মাছের পেটের মধ্য থেকে সেখানে তো অন্ধকার ছিলই, তার ওপর ছিল সাগরের অন্ধকার।

৮৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান ৩৭ থেকে ৪১ আয়াত টীকাসহ, সূরা মারয়াম ২ থেকে ১৫ আয়াত টীকাসহ। স্ত্রীকে যোগ্য করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, তার বন্ধাত্ব দূর করে দেয়া এবং বার্ধক্য সত্ত্বেও তাকে গর্ভধারণের উপযোগী করা। "সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তুমিই" মানে হচ্ছে, তুমি সন্তান না দিলে কোনো দুঃখ নেই। তোমার পবিত্র সত্তা-উত্তরাধিকারী হবার জন্য যথেষ্ট।

৮৭. এই প্রেক্ষাপটে যে উদ্দেশ্যে নবীদের উল্লেখ করা হয়েছে তা আবার স্মৃতিপটে জাগিয়ে তুলুন। হযরত যাকারিয়ার (আ) ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা হৃদয়ংগম করানো যে, এ সকল নবীই ছিলেন নিছক বান্দা ও মানুষ। ইলাহী সার্বভৌমত্বের সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে ছিল না। তারা অন্যদেরকে সন্তান দান করতেন না বরং নিজেরাই আল্লাহর সামনে সন্তানের জন্য হাত পাততেন। হযরত ইউনুসের কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, একজন মহিমান্বিত নবী হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি ভুল করে বসলেন তখন তাকে পাকড়াও করা হলো এবং যখন তিনি নিজের রবের সামনে অবনত হলেন তখন তাঁর প্রতি অনুগ্রহও এমনভাবে করা হয়েছে যে, মাছের পেট থেকে তাঁকে জীবিত বের করে আনা হয়েছে। হযরত আইয়ুবের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, নবীর বিপদে পড়া কোনো অভিনব ব্যাপার নয় এবং নবীও যখন বিপদে পড়েন তখন একমাত্র আল্লাহরই সামনে ত্রাণের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি অন্যের ত্রাণকারী নন বরং আল্লাহর কাছে ত্রাণ ভিক্ষাকারী। তারপর এসব কথার সাথে সাথে একদিকে এ সত্যটি মনে বদ্ধমূল করতে চাওয়া হয়েছে যে, এ সকল নবীই ছিলেন তাওহীদের প্রবক্তা এবং নিজেদের

وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۝ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۝

আর সেই মহিলা যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল,[৮৮] আমি তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম নিজের রূহ থেকে[৮৯] এবং তাকে ও তার পুত্রকে সারা দুনিয়ার জন্য নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম।[৯০]

তোমাদের এ উম্মত আসলে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। কাজেই তোমরা আমার ইবাদাত করো। কিন্তু (নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে) লোকেরা পরস্পরের মধ্যে নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।[৯১]—সবাইকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।

প্রয়োজন তাঁরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর সামনে পেশ করতেন না আবার অন্যদিকে একথাও বুঝিয়ে দেয়া কাম্য যে, আল্লাহ হামেশা অস্বাভাবিকভাবে নিজের নবীদেরকে সাহায্য করতে থেকেছেন। শুরুতে তাঁরা যতই পরীক্ষার সম্মুখীন হোন না কেনো শেষ পর্যন্ত অলৌকিক পদ্ধতিতে তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে।

৮৮. এখানে হযরত মার্‌য়াম আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে।

৮৯. হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও বলা হয়েছে ঃ

اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

"আমি মাটি থেকে একটি মানুষ তৈরি করছি। কাজেই (হে ফেরেশতারা!) যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে তৈরি করে নেবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় অবনত হয়ে যাবে।" (সাদ ঃ ৭১-৭২)

একথাই হযরত ঈসা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। সূরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ

رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗٓ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ

"আল্লাহর রসূল এবং তাঁর ফরমান, যা মার্‌য়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তার পক্ষ থেকে একটি রূহ।" (১৭১ আয়াত)

সূরা তাহরীমে বলা হয়েছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

"আর ইমরানের মেয়ে মার্‌য়াম যে নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছিল, কাজেই ফুঁকে দিলাম. আমি তার মধ্যে নিজের রূহ।" (১২ আয়াত)

এ সংগে এ বিষয়টিও সামনে থাকা দরকার যে, মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আ) ও হযরত আদমের (আ) জন্মকে পরস্পরের সদৃশ গণ্য করেন। তাই সূরা আলে ইমরানে বলেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ، خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে আদমের মতো, যাকে আল্লাহ মাটি থেকে তৈরি করেন তারপর বলেন, "হয়ে যাও" এবং সে হয়ে যায়।" (৫৯ আয়াত)

এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে একথা বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক সৃষ্টি পদ্ধতির পরিবর্তে যখন আল্লাহ কাউকে নিজের হুকুমের সাহায্যে অস্তিত্বশীল করে জীবন দান করেন তখন একে "নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছি" শব্দাবলীর সাহায্যে বিবৃত করেন। এ রূহের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সম্ভবত এ জন্য করা হয়েছে যে, এর ফুঁকে দেওয়াটা অলৌকিক ধরনের। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ২১২-২১৩ টীকা।

৯০. অর্থাৎ তারা মা ও ছেলে দু'জনের কেউই আল্লাহ বা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক ছিলেন না বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন ছিলেন। তারা কোন্ অর্থে নিদর্শন ছিলেন ? এর ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা মার্‌য়াম ২১ এবং সূরা আল মু'মিনূন ৪৩ টীকা।

৯১. এখানে !তোমরা" শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র মানবতাকে। এর অর্থ হচ্ছে, হে মানব জাতি! তোমরা সবাই আসলে একই দল ও একই মিল্লাতের অন্তরভুক্ত। দুনিয়ায় যত নবী এসেছেন তাঁরা সবাই একই দীন ও জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। আর তাঁদের সেই আসল দীন এই ছিল ঃ কেবলমাত্র এক ও একক আল্লাহই মানুষের রব এবং এক আল্লাহরই বন্দেগী ও পূজা করা উচিত। পরবর্তীকালে যতগুলো ধর্ম তৈরী হয়েছে সবগুলো এ দীনেরই বিকৃত রূপ। কেউ এর কোনো একটি জিনিস নিয়েছে, কেউ অন্যটি, আবার কেউ তৃতীয়টি। এদের প্রত্যেকে আবার এই দীনের একটি অংশ নিয়ে তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে অনেক কিছু মিশিয়ে দিয়েছে। এভাবে এই অসংখ্য দীন ও মিল্লাতের সৃষ্টি হয়েছে। এখন অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, অমুক নবী অমুক ধর্মের ভিত গড়েছেন এবং নবীগণ মানব জাতিকে এই বহুধর্ম ও বহু মিল্লাতে বিভক্ত করেছেন, এ ধরনের কথা নিছক বিভ্রান্ত চিন্তার ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব দীন ও মিল্লাত নিজেদেরকে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন দেশের নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করছে বলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় বিভিন্নতা নবীদের সৃষ্টি। আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ দশটি বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁরা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করা শিক্ষা দিতে পারেন না।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا
لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾
حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ
يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا
ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۭ اَنْتُمْ
لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾

৭ রুকূ'

কাজেই যে ব্যক্তি মু'মিন থাকা অবস্থায় সৎকাজ করে, তার কাজের অমর্যাদা করা হবে না এবং আমি তা লিখে রাখছি। আর যে জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তার অধিবাসিরা আবার ফিরে আসবে, এটা সম্ভব নয়।[৯২] এমন কি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে খুলে দেয়া হবে, প্রতি উচ্চ ভূমি থেকে তারা বের হয়ে পড়বে এবং সত্য ওয়াদা পুরা হবার সময় কাছে এসে যাবে[৯৩] তখন যারা কুফরী করেছিল হঠাৎ তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম বরং আমরা দোষী ছিলাম।"[৯৪] অবশ্যই তোমরা এবং তোমাদের যেসব মাবুদকে তোমরা পূজা করো, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন, সেখানেই তোমাদের যেতে হবে।[৯৫]

৯২. এ আয়াতটির তিনটি অর্থ হয় ঃ

এক ঃ যে জাতি একবার আল্লাহর আযাবের মুখোমুখি হয়েছে সে আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারেনি। তার পুনরুত্থান ও নব জীবন লাভ সম্ভব নয়।

দুই ঃ ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার তার এই দুনিয়ায় ফিরে আসা এবং পুনরায় পরীক্ষার সুযোগ লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব। এরপর তো আল্লাহর আদালতেই তার শুনানি হবে।

তিন ঃ যে জাতির অন্যায় আচরণ, ব্যভিচার, বাড়াবাড়ি ও সত্যের পথ নির্দেশনা থেকে দিনের পর দিন মুখ ফিরিয়ে নেয়া এত বেশী বেড়ে-যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে

তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তাকে আবার ফিরে আসার ও তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয় না। গোমরাহী থেকে হেদায়াতের দিকে ফিরে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব হতে পারে না।

৯৩. ইয়াজুজ ও মাজুজের ব্যাখ্যা সূরা কাহাফের ৬২ ও ৬৯ টীকায় করা হয়েছে। তাদেরকে খুলে দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা দুনিয়ার ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন মনে হবে কোনো হিংস্র পশুকে হঠাৎ খাঁচা বা বন্ধন মুক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। "সত্য ওয়াদা পুরা হবার সময় কাছে এসে যাবে" এর মধ্যে পরিষ্কার এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের এ বিশ্বব্যাপী আক্রমণ শেষ জামানায় হবে এবং এর পর দ্রুত কিয়ামত এসে যাবে। এ অর্থকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটিও আরো বেশী সুস্পষ্ট করে দেবে যা ইমাম মুসলিম হুযাইফা ইবনে আসীদিল গিফারী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ "কিয়ামত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা তার মধ্য থেকে দশটি আলামত দেখে নেবে ঃ ধোঁয়া, দাজ্জাল, মাটির পোকা, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ঈসা ইবনে মার্‌য়ামের অবতরণ, ইয়াজুজ মাজুজের আক্রমণ, তিনটি বৃহত্তম ভূমি ধ্বস (Land slide) একটি পূর্বে, অন্যটি পশ্চিমে ও তৃতীয়টি আরব উপদ্বীপে এবং সব শেষে ইয়ামন থেকে একটি ভয়াবহ আগুন উঠবে যা লোকদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে (অর্থাৎ এরপর কিয়ামত এসে যাবে।) অন্য এক হাদীসে ইয়াজুজ মাজুজের উল্লেখ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে সময় কিয়ামত এত বেশী নিকটবর্তী হবে যেন পূর্ণ গর্ভবর্তী মহিলা বলতে পারছে না কখন তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে, রাতে বা দিনে যে কোনো সময় (كالحامل المتم لايدرى اهلها متى تفجؤهم بولدها ليلا او نهارا) কিন্তু কুরআন মজীদ ও হাদীসসমূহে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা থেকে একথা পরিষ্কার হয় না যে, এরা দুয়ে মিলে একজোট হয়ে একসাথে দুনিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হতে পারে কিয়ামতের নিকটতর যুগে এরা দুয়ে পারস্পরিক লড়াইয়ে লিপ্ত হবে এবং তারপর এদের লড়াই একটি বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের কারণ হবে।

৯৪. গাফলতির মধ্যে তবুও এক ধরনের ওজর পাওয়া যায়। তাই তারা নিজেদের গাফলতি বর্ণনা করার পর আবার নিজেরাই পরিষ্কার স্বীকার করবে, নবীগণ এসে আমাদের এ দিনটি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কাজেই মূলত আমরা গাফেল ও বেখবর ছিলাম না বরং দোষী ও অপরাধী ছিলাম।

৯৫. হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াতের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনুয যাবারা আপত্তি করে বলেন যে, এভাবে তো কেবলমাত্র আমাদেরই মাবুদরা জাহান্নামে যাবে না বরং ঈসা, উযাইর ও ফেরেশতারাও জাহান্নামে যাবে, কারণ দুনিয়ায় তাদেরও ইবাদাত করা হয়। এর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

كل من احب ان يعبد من دون الله فهو مع من عبده

"হাঁ, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজে একথা পছন্দ করে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার বন্দেগী করা হোক সে তাদেরই সাথে হবে যারা তার বন্দেগী করেছে।"

لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ۖ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۗ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

যদি তারা সত্যিই আল্লাহ হতো, তাহলে সেখানে যেতো না। এখন সবাইকে চিরদিন তারই মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে তারা হাঁসফাঁস করতে থাকবে[৯৬] এবং তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা কোনো কথা শুনতে পাবে না। তবে যাদের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে পূর্বাহ্নেই কল্যাণের ফায়সালা হয়ে গিয়েছে তাদেরকে অবশ্যি এ থেকে দূরে রাখা হবে,[৯৭] তার সামান্যতম খস্‌খসানিও তারা শুনবে না এবং তারা চিরকাল নিজেদের মনমতো জিনিসের মধ্যে অবস্থান করবে। সেই চরম ভীতিকর অবস্থা তাদেরকে একটুও পেরেশান করবে না[৯৮] এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে এই বলে, "এ তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।"

এ থেকে জানা যায়, যারা দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহর বন্দেগী করার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং লোকেরা তাদেরকেই উপাস্যে পরিণত করে অথবা যারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর যে, দুনিয়ায় তাদের বন্দেগী ও পূজা করা হচ্ছে এবং এ কর্মে তাদের ইচ্ছা ও আকাংখার কোনো দখল নেই, তাদের জাহান্নামে যাবার কোনো কারণ নেই। কারণ, তারা এ শিরকের জন্য দায়ী নয়। তবে যারা নিজেরাই উপাস্য ও পূজনীয় হবার চেষ্টা করে এবং মানুষের এ শিরকে যাদের সত্যি সত্যিই দখল আছে তারা সবাই নিজেদের পূজারী ও উপাসকদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অনুরূপভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে মাবুদ হিসেবে দাঁড় করায় তারাও জাহান্নামে যাবে। কারণ, এ অবস্থায় তারাই মুশরিকদের আসল মাবুদ হিসেবে গণ্য হবে, এ দুর্বৃত্তরা বাহ্যত যাদেরকে মাবুদ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল তারা নয়। শয়তানও এর আওতায় এসে যায়। কারণ, তার উদ্যোগে যেসব সত্তাকে উপাস্যে পরিণত করা হয় আসল উপাস্য তারা হয় না। বরং আসল উপাস্য হয় শয়তান নিজেই। কারণ, তার হুকুমের আনুগত্য করে এ কাজটি করা হয়। এ ছাড়াও পাথর, কাঠের মূর্তি ও অন্যান্য পূজা সামগ্রীও মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, যাতে তারা তাদের ওপর জাহান্নামের আগুন আরো বেশী করে জ্বালিয়ে দিতে সাহায্য করে। যাদের ব্যাপারে তারা আশা পোষণ করছিল যে, তারা তাদের

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

সেদিন, যখন আকাশকে আমি এমনভাবে গুটিয়ে ফেলবো যেমন বাণ্ডিলের মধ্যে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত কাগজ, যেভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে আবার তার পুনরাবৃত্তি করবো, এ একটি প্রতিশ্রুতি, যা আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত এবং এ কাজ আমাকে অবশ্যই করতে হবে। আর যবুরে আমি উপদেশের পর একথা লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দারা। এর মধ্যে একটি বড় খবর আছে ইবাদাতকারী লোকদের জন্য।[৯৯]

হে মুহাম্মাদ! আমি যে তোমাকে পাঠিয়েছি, এটা আসলে দুনিয়াবাসীদের জন্য আমার রহমত।[১০০]

সুপারিশকারী হবে, তারা উলটো তাদের আযাব কঠোরতর করার কারণে পরিণত হয়েছে দেখে তাদের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে।

৯৬. মূলে زَفِيْر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভয়ংকর গরম, পরিশ্রম ও ক্লান্তিকর অবস্থায় মানুষ যখন টানা টানা শ্বাস নিয়ে তাকে সাপের ফোঁসফোঁসানীর মতো করে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বের করে তখন তাকে "যাফীর" বলা হয়।

৯৭. এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা দুনিয়ায় নেকী ও সৌভাগ্যের পথ অবলম্বন করেছে। এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ পূর্বাহ্নে ওয়াদা করেছেন যে, তারা এর আযাব থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং তাদেরকে নাজাত দেয়া হবে।

৯৮. অর্থাৎ হাশরের দিন এবং আল্লাহর সামনে হাজির হবার সময়, যা সাধারণ লোকদের জন্য হবে চরম ভীতি ও পেরেশানীর সময়, নেকলোকেরা সে সময় একটি মানসিক নিশ্চিন্ততার মধ্যে অবস্থান করবে। কারণ, সবকিছু ঘটতে থাকবে তাদের আশা-আকাংখা ও কামনা-বাসনা অনুযায়ী। ঈমান ও সৎকাজের যে পুঁজি নিয়ে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল তা সে সময় পর্যন্ত আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের মানোবল দৃঢ় করবে এবং ভয় ও দুঃখের পরিবর্তে তাদের মনে এ আশার সঞ্চার করবে যে, শীঘ্রই তারা নিজেদের প্রচেষ্টা ও তৎপরতার সুফল লাভ করবে।

৯৯. এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করতে অনেকে ভীষণভাবে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তারা এর এমন একটি অর্থ বের করে নিয়েছেন যা সমগ্র কুরআনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ায় এবং দীনের সমগ্র ব্যবস্থাটিকেই শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেয়। তারা আয়াতের অর্থ এভাবে করেন যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যমীনের উত্তরাধিকার (অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসন এবং পৃথিবীর বস্তু সম্পদ ও উপকরণাদির ভোগ-ব্যবহার) শুধুমাত্র সৎলোকেরাই লাভ করে থাকে এবং তাদেরকেই আল্লাহ এ নিয়ামত দান করেন। তারপর এ সার্বিক নিয়ম থেকে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে, সৎ ও অসতের মধ্যকার ফারাক ও পার্থক্যের মানদণ্ড হচ্ছে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকার । যে এ উত্তরাধিকার লাভ করে সে সৎ এবং যে এ থেকে বঞ্চিত হয় সে অসৎ। এরপর তারা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে দুনিয়ায় ইতিপূর্বে যেসব জাতি পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভ করেছিল এবং যারা আজ উত্তরাধিকারী হয়ে আছে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়। এখানে কাফের, মুশরিক, নাস্তিক, দুষ্কৃতিকারী সবাই এ উত্তরাধিকার আগেও লাভ করেছে এবং আজো লাভ করছে। কুরআন যেসব গুণকে কুফরী, ফাসেকী, দুষ্কৃতি, পাপ ও অসৎ বলে চিহ্নিত করেছে যেসব জাতির মধ্যে সেগুলো পাওয়া গেছে এবং আজো পাওয়া যাচ্ছে তারা এ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি বরং এটি তাদেরকে দান করা হয়েছে এবং আজো দান করা হচ্ছে। ফেরাউন, নমরূদ থেকে শুরু করে এ যুগের কম্যুনিষ্ট শাসকরা পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক লোক প্রকাশ্যে আল্লাহকে অস্বীকার করে, আল্লাহর বিরোধিতা করে বরং আল্লাহর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এবং এর পরেও তারা যমীনের উত্তরাধিকার লাভ করেছে। এ চিত্র দেখে তারা এ মত পোষণ করেন যে, কুরআন বর্ণিত সার্বিক নিয়ম তো ভুল হতে পারে না। কাজেই ভুল যা কিছু তা এ "সৎ" শব্দটির অর্থের মধ্যে রয়ে গেছে। অর্থাৎ মুসলমানরা এ পর্যন্ত "সালেহ" বা "সৎ" শব্দটির যে অর্থ গ্রহণ করে এসেছে তা সম্পূর্ণ ভুল। তাই তারা সৎ শব্দটির একটি নতুন সংজ্ঞা তালাশ করছেন। এ শব্দটির এমন একটি অর্থ তারা চাচ্ছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভকারী সকল ব্যক্তি সমানভাবে "সৎ" গণ্য হতে পারে। তিনি আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক অথবা চেংগীস ও হালাকু যে কেউ হতে পারেন। এ নতুন অর্থ সন্ধান করার ক্ষেত্রে ডারউইনের ক্রমবিবর্তন মতবাদ তাদেরকে সাহায্য করে। ফলে তারা কুরআনের "সৎ" (صلاح)-এর মতবাদকে ডারউইনী "যোগ্যতা" বা Fitness (صلاحيت)-এর মত্বাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

এ সংশ্লিষ্ট তাফসীরের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই ঃ যে ব্যক্তি বা দল দেশ জয় করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে, তার ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাবার এবং পৃথিবীর বস্তু সম্পদ ও জীবন যাপনের উপকরণাদি সাফল্যের সাথে ব্যবহার করার যোগ্যতা রাখে সে-ই হচ্ছে "আল্লাহর সৎ বান্দা।" তার এ কর্ম সমস্ত "ইবাদাত গুজার" মানব সমাজের জন্য এমন একটি বাণী যাতে বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি ও দল যে কাজটি করছে সেটিই "ইবাদাত"। তোমরা যদি এ ইবাদাত না করো এবং পরিণামে পৃথিবীর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যাও তাহলে তোমাদেরকে "সৎলোক"দের মধ্যে গণ্য করা হবে না এবং তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত গুজার বান্দাও বলা যেতে পারে না।

এ অর্থ গ্রহণ করার পর এদের সামনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, যদি "সততা" ও "ইবাদাতের" সংজ্ঞা এই হয়ে থাকে তাহলে ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান,

রসূলের প্রতি ঈমান ও কিতাবের প্রতি ঈমান) এর অর্থ কি ? ঈমান ছাড়া তো স্বয়ং এ কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর কাছে কোনো সৎকাজ গ্রহণযোগ্য নয়। আর তাছাড়া এরপর কুরআনের এ দাওয়াতের কি অর্থ হবে যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে নৈতিক ব্যবস্থা ও জীবন বিধান পাঠিয়েছেন তার আনুগত্য করো ? আবার বারবার কুরআনের একথা বলার অর্থই বা কি যে, রসূলকে যে মানে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের যে আনুগত্য করে না সে কাফের, ফাসেক, শাস্তিলাভের অধিকারী এবং আল্লাহর দরবারে ঘৃণিত অপরাধী ? এ প্রশ্নগুলো এমন পর্যায়ের ছিল যে, এরা যদি ঈমানদারীর সাথে এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন তাহলে অনুভব করতেন যে, এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার এবং সততার একটি নতুন ধারণা সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা ভুল করছেন। কিন্তু তারা নিজেদের ভুল অনুভব করার পরিবর্তে অত্যন্ত দুঃসাহসের সাথে ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ, আখেরাত, রিসালাত প্রত্যেকটি জিনিসের অর্থ বদলে দিয়েছেন। শুধুমাত্র এ সবগুলোকে তাদের একটি আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য। একটিমাত্র জিনিসকে সঠিকভাবে বসাবার জন্য তারা কুরআনের সমস্ত শিক্ষাকে ওলট-পালট করে দিয়েছেন। এর ওপর আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যারা তাদের এ "দীনের মেরামতি"র বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে তারা উলটো অভিযোগ আনছেন এই বলে যে, "নিজেরা পরিবর্তিত না হয়ে করছেন কুরআনের পরিবর্তন।" এটি আসলে বস্তুগত উন্নয়নেচ্ছার বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু লোক মারাত্মকভাবে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এ জন্য তারা কুরআনের অর্থ বিকৃত করতেও দ্বিধা করছেন না।

তাদের এ ব্যাখ্যার প্রথম মৌলিক ভুলটি হচ্ছে এই যে, তারা কুরআনের একটি আয়াতের এমন একটি ব্যাখ্যা করছেন যা কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষার বিরোধী। অথচ নীতিগতভাবে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের এমন ব্যাখ্যাই সঠিক হতে পারে যা তার অন্যান্য বর্ণনা ও তার সামগ্রিক চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। যে ব্যক্তি কুরআনকে অন্তত একবারও বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছেন তিনি একথা না জেনে পারেন না যে, কুরআন যে জিনিসকে নেকী, তাকওয়া ও কল্যাণ বলছে তা "বস্তুগত উন্নতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতার" সমার্থক নয়। আর "সৎ"-কে যদি "যোগ্যতা সম্পন্ন"-এর অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এ একটি আয়াত সমগ্র কুরআনের বিরোধী হয়ে ওঠে।

তাদের এ ভুলের দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই যে, তারা একটি আয়াতকে তার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে আলাদা করে নিয়ে নির্দ্বিধায় ইচ্ছামতো যে কোনো অর্থ তার শব্দাবলী থেকে বের করে নিচ্ছেন। অথচ প্রত্যেকটি আয়াতের সঠিক অর্থ কেবলমাত্র সেটিই হতে পারে যা তার পূর্বাপর সম্পর্কের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। যদি এ ভুলটি তারা না করতেন তাহলে সহজেই দেখতে পেতেন যে, উপর থেকে ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়বস্তু চলে আসছে সেখানে আখেরাতের জীবনে সৎকর্মশীল মু'মিন এবং কাফের ও মুশরিকদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়বস্তুর মধ্যে আকস্মিকভাবে দুনিয়ায় যমীনের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা কোন্ নিয়মের ভিত্তিতে চলছে একথা বলার সুযোগ কোথায় পাওয়া গেলো ?

কুরআন ব্যাখ্যার সঠিক নীতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে আয়াতের অর্থ পরিষ্কার। অর্থাৎ এর আগের আয়াতে যে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে সে সৃষ্টিকালে যমীনের

উত্তরাধিকারী হবে শুধুমাত্র সৎকর্মশীল লোকেরা। সেই চিরন্তন জীবনের ব্যবস্থাপনায় বর্তমানের সাময়িক জীবন ব্যবস্থার অবস্থা বিরাজিত থাকবে না। এখানে বর্তমানে জীবন ব্যবস্থায় তো যমীনে জালেম ও ফাসেকদেরও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় কিন্তু সেখানে তা হবে না। সূরা মু'মিনূনের ৪-১১ আয়াতে এ বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে। এর চাইতেও পরিষ্কার ভাষায় সূরা যুমারের শেষে বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ কিয়ামত এবং প্রথম সিংগাধ্বনি ও দ্বিতীয় সিংগাধ্বনির কথা বলার পর নিজের ন্যায় বিচারের উল্লেখ করেছেন এবং তারপর কুফরীর পরিণাম বর্ণনা করে সৎলোকদের পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○ - الزمر : ٧٣-٧٤

"আর যারা নিজেদের রবের ভয়ে তাকওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা সেখানে পৌঁছে যাবে, তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার ব্যবস্থাপক তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা খুব ভালো থেকেছো, এখন এসো, এর মধ্যে চিরকাল থাকার জন্য প্রবেশ করো। আর তারা বলবে ঃ প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের সাথে তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের যমীনের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা নিজেদের জায়গা তৈরি করে নিতে পারি। কাজেই সর্বোত্তম প্রতিদান হচ্ছে সৎকর্মশীলদের জন্য।" (যুমার ঃ ৭৩-৭৪)

দেখুন এ দু'টি আয়াত একই বিষয় বর্ণনা করছে এবং দু'জায়গায়ই যমীনের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক পরকালীন জগতের সাথে প্রতিষ্ঠিত, ইহকালীন জগতের সাথে নয়।

এখন যবুরের প্রসংগে আসা যাক। আলোচ্য আয়াতে এর বরাত দেয়া হয়েছে। যদিও আমাদের পক্ষে একথা বলা কঠিন যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মে যবুর নামে যে পুস্তকটি বর্তমানে পাওয়া যায় তা তার আসল অবিকৃত অবস্থায় আছে কি নেই। কারণ, এখানে দাউদের গীতের মধ্যে অন্য লোকদের গীতও মিশে একাকার হয়ে গেছে এবং মূল যবুরের কপি কোথাও নেই। তবুও যে যবুর বর্তমানে আছে সেখানেও নেকী, সততা, সত্যনিষ্ঠা ও আল্লাহ নির্ভরতার উপদেশ দেয়ার পর বলা হচ্ছে ঃ

"কারণ দুরাচারগণ উচ্ছিন্ন হইবে, কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারাই দেশের অধিকারী হইবে। আর ক্ষণকাল, পরে দুষ্টলোক আর নাই, তুমি তাহার স্থান তত্ব করিবে, কিন্তু সে আর নাই। কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হইবে এবং শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে। .... তাহাদের অধিকার চিরকাল থাকিবে। .... ধার্মিকেরা দেশের অধিকারী হইবে, তাহারা নিয়ত তথায় বাস করিবে।" (দাউদের সংগীত ৩৭ ঃ ৯, ১০, ১১, ১৮, ২৯

দেখুন এখানে ধার্মিকদের জন্য যমীনের চিরন্তন উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, আসমানী কিতাবগুলোর দৃষ্টিতে "খুলূদ", "তথা চির অবস্থান" ও চিরন্তন জীবন আখেরাতেই হয়ে থাকে, এ দুনিয়ায় নয়।

দুনিয়ায় যমীনের সাময়িক উত্তরাধিকার যে নিয়মে বণ্টিত হয় তাকে সূরা আ'রাফে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ

"যমীনের মালিক আল্লাহ, নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন ." (১২৮ আয়াত)

আল্লাহর ইচ্ছার আওতায় মু'মিন ও কাফের, সৎ ও অসৎ এবং হুকুম পালনকারী ও হুকুম অমান্যকারী নির্বিশেষে সবাই এর উত্তরাধিকার লাভ করে। কর্মফল হিসেবে তারা এটা লাভ করে না বরং লাভ করে পরীক্ষা হিসেবে। যেমন এ আয়াতের পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

"আর তিনি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন তারপর দেখবেন তোমরা কেমন কাজ করো ।" (১২৯ আয়াত)

এ উত্তরাধিকার চিরন্তন নয় এটি নিছক একটি পরীক্ষার ব্যাপার। আল্লাহর একটি নিয়মের আওতায় দুনিয়ায় বিভিন্ন জাতিকে পালাক্রমে এ পরীক্ষায় ফেলা হয়. বিপরীতপক্ষে আখেরাতে এ যমীনেরই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে এবং কুরআনের বিভিন্ন সুস্পষ্ট উক্তির আলোকে তা যে নিয়মের ভিত্তিতে হবে তা হচ্ছে এই যে, "যমীনের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে একমাত্র সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে এর উত্তরাধিকারী করবেন। পরীক্ষা করার জন্য নয় বরং দুনিয়ায় তারা যে সৎ প্রবণতা অবলম্বন করেছিল তার চিরন্তন প্রতিদান হিসেবে " (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, ৮৩ টীকা)।

১০০. এর আর একটি অনুবাদ হতে পারে, "আমি তোমাকে দুনিয়াবাসীদের জন্য রহমতে পরিণত করেই পাঠিয়েছি।" উভয় অবস্থায়ই এর অর্থ হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন আসলে মানব জাতির জন্য আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ। কারণ, তিনি এসে গাফলতিতে ডুবে থাকা দুনিয়াকে জাগিয়ে দিয়েছেন তাকে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফারাক করার জ্ঞান দিয়েছেন। দ্বিধাহীন ও সংশয় বিমুক্ত পদ্ধতিতে তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য ধ্বংসের পথ কোনটি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পথ কোনটি। মক্কার কাফেররা নবীর (সা) আগমনকে তাদের জন্য বিপদ ও দুঃখের কারণ মনে করতো। তারা বলতো, এ ব্যক্তি আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, নখ থেকে গোশত আলাদা করে রেখে দিয়েছে। তাদের একথার জবাবে বলা হয়েছে ঃ অজ্ঞের দল! তোমরা যাকে দুঃখ ও কষ্ট মনে করো তা আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রহমত।

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

এদেরকে বলো, "আমার কাছে যে অহী আসে তা হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র এক ইলাহই তোমাদের ইলাহ, তারপর কি তোমরা আনুগত্যের শির নত করছো ?" যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও, "আমি সোচ্চার কণ্ঠে তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি। এখন আমি জানি না, তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে[১০১] *তা আসন্ন, না দূরবর্তী।" আল্লাহ সে কথাও জানেন যা সোচ্চার কণ্ঠে বলা হয় এবং তাও যা তোমরা গোপনে করো।*[১০২] *আমিতো মনে করি, হয়তো এটা (বিলম্ব) তোমাদের জন্য এটা পরীক্ষা*[১০৩] *এবং একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত তোমাদের জীবন উপভোগ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে।*

(শেষে) রসূল বললো ঃ "হে আমার রব! তুমি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দাও। আর হে লোকেরা ! তোমরা যেসব কথা তৈরি করছো তার মুকাবিলায় আমাদের দয়াময় রবই আমাদের সাহায্যকারী সহায়ক।"

১০১. অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও। রিসালাতের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে যে কোনো ধরনের আযাবের আকারে আল্লাহর যে পাকড়াও আসবে।

১০২. সূরার শুরুতে যেসব বিরোধিতাপূর্ণ কথা, ষড়যন্ত্র ও নীরব কানাকানির কথা বলা হয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেখানেও রসূলের মুখ দিয়ে এদের এ জবাব দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা যেসব কথা বলছো সেগুলো সবই আল্লাহ শুনছেন এবং তিনি সেগুলো জানেন। অর্থাৎ এমন মনে করো না যে, এসব বাতাসে উড়ে গেছে এবং এসবের জন্য আর কখনো জবাবদিহি করতে হবে না।

১০৩. অর্থাৎ এ বিলম্বের কারণে তোমরা পরীক্ষার মুখোমুখী হয়েছো। তোমাদের সামলে ওঠার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেবার এবং দ্রুততা অবলম্বন করে সংগে সংগেই

পাকড়াও না করার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে তোমরা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছো। তোমরা মনে করছো, নবীর সব কথা মিথ্যা। নয়তো ইনি যদি সত্য নবীই হতেন এবং যথার্থ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসতেন, তাহলে একে মিথ্যা বলার ও অমান্য করার পর আমরা কবেই পাকড়াও হয়ে যেতাম।

❐